মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব

মোহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

জন্ম ১০ জানুয়ারি ১৯৫৯। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জেলা উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমা ও থানার চৈতা গ্রামে বিখ্যাত বিশ্বাস পরিবারে। পিতা মুহম্মদ তছিমুদ্দীন বিশ্বাস (১৯১৭-১৯৮০), মাতা অহিদা খাতুন (১৯২৩-২০০৮)। এগারো ভাই-বোনের মধ্যে নবম। শিক্ষা-দীক্ষা ভারতে। ভাষা শিক্ষা ও ভাষা চর্চা আজীবনের সাধনা। সাংবাদিকতা ও গণসংযোগে ডিপোমাও করেন গত শতাব্দীর আশির দশকে। বহুমুখী প্রতিভাধর কবি। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ভিড়ের মাঝে আমরা দুজন' (১৯৮৯) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া আছে 'কাব্য আমপারা' (২০০০), ঢাকা, কালিদাসের 'মেঘদূত' (২০০৬), 'ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (যন্ত্রস্থ), গালিবের শের (যন্ত্রস্থ)। আছে উপন্যাস 'যমুনার ধারা বহে' (২০০৪), মোলা নাসিরুদ্দীন (২০০৪), অনূদিত উপন্যাস 'রক্ত রাঙা পথ' (২০০৫), 'একটি প্রেমের স্মৃতি' (২০০৮), মূল ভাষা ঠেট আউধী থেকে অনুবাদ করেন মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদমাবত' (২০০৮)। বিশ্বনবী হজরত মুহম্মদ (স.) সম্পর্কে তাঁর প্রণীত ও অনূদিত গ্রন্থ সংখ্যা বাংলা ভাষায় সম্ভবত তাঁরই সবচেয়ে বেশি।

ধর্ম-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি, ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থাদিও প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা এবং কলকাতা থেকে। ঐতিহ্য থেকে প্রকাশিত হয়েছে, 'মোগল সম্রাট হুমায়ূন' (২০০৫), 'মোগল শাসন ব্যবস্থা' (২০০৭), আলবিরুনির 'ভারতত্ত্ব' (২০০৭), 'ফিকহুস সিরাত' (২০০৮), 'বেহেস্তি জেওর' (২০০৯) প্রভৃতি গ্রন্থ। 'ঐতিহ্য'-র তাঁর নবতম সংযোজন ড. ভোলানাথ তেওয়ারির 'ভাষাবিজ্ঞান' ও মোগল সম্রাট বাবরের আত্মকথা 'বাবরনামা'। ইবনে বতুতার সফরনামা (২০০৪) সহ এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৮০-র অধিক। জেলা উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মহান সন্তান শহীদ তিতুমীর, মাওলানা আকরম খাঁ, আলামা রুহুল আমীন, শেখ আবদুর রহিম, কবি শাহাদাত হোসেন, ড. মুহম্মদ শহীদুলাহ প্রমুখের সোনালি শৃঙ্খলের ধারাবাহিকতায় ইনি অন্যতম মহান সংযোজন বলে অভিহিত হন। পেশা সাহিত্য।

মোগল সম্রাট
আওরঙ্গজেব

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১০৩৪৭, ৫৮৬১১৩০১

www.pathagar.com

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
শাহীদ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ- ৪৭১১০৩৪৭, ৫৮৬১১৩০১
E-mail : gyankoshprokashoni@gmail.com
gk_tarafder@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি, ২০১৮
প্রচ্ছদ
মো. জহিরুল ইসলাম

মুদ্রণ
নোভা প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
১৫/ বি,মিরপুর রোড ঢাকা ১২০৫
ফোনঃ ৯৬৬৭৯১৯

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা মাত্র।
ISBN: 978-984-93525-0-1

রকমারি.কম থেকে বই অর্ডার করতে ভিজিট করুনঃ
https://www.rokomari.com/book/publisher/16/

www.pathagar.com

উৎসর্গ

এমদাদুল হক নূর

১৯৮১-তে যে 'কাফেলা'-র যাত্রী হয়ে পথচলা শুরু,
'নতুন গতি'-তে তা গতিমান অনন্ত কালের উদ্দেশে–

জালালউদ্দীন
জানুয়ারি ২০১৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

প্রথম পরিচ্ছেদ
ভূমিকা– ১১
আওরঙ্গজেব : জন্ম, বাল্য ও শিক্ষণকাল– ১৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব– ২৩
দারার ভুলভ্রান্তি ও গুণ-দোষ– ২৬

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সামুগড়ের যুদ্ধ ও আওরঙ্গজেবের বিজয়– ৩৫

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
আওরঙ্গজেবের প্রথম রাজ্যাভিষেক ও দারার পতন– ৪৩

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
আওরঙ্গজেব ও উত্তর ভারত– ৫৩

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান– ৬৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে মুসলমানদের রাজনৈতিক বিজয়ের সূচনা হয়েছিল ৭১২ ঈসায়ী অব্দে মুহম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমে। তারপর মুসলমানদের ধারাবাহিক রাজনৈতিক বিজয়ের ধারা শতাব্দী কাল ব্যাপী অব্যাহত থাকে। এই ধারাবাহিকতায় মহান যোগদান রয়েছে সুলতান মাহমুদ গজনবির। তারপরে আসেন মুইজউদ্দীন মুহম্মদ বিন সাম ওরফে মুহম্মদ ঘুরী। ঘুরীর বিজয়ের বিশেষত্ব ছিল তিনি সুসংহতভাবে বিজয় সম্পন্ন করেন এবং তাঁর বিশ্বস্ত দাস সেনাপতি কুতুবউদ্দীন আইবেককে, মুক্তির সনদ পত্র দিয়ে দিল্লিতে মুসলিম সালতানাতের ভিত্তি স্থাপন করেন। সেই সাথে সাথে ভারতে আরেকটি সালতানাত কায়েম হয়, তা ছিল ইসলামের আধ্যাত্মিক সালতানাত। এ সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট ছিলেন খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.)। স্বয়ং মহানবি হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর নির্দেশ ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত এ মহান সাধক ভারতের রাজস্থান প্রদেশের আজমীঢ় এ এক অলৌকিক আধ্যাত্মিক সিংহাসনে সমাসীন হয়ে ভারতবাসীর হৃদয়ের ওপর অনন্তকালের জন্য তাঁর শাসন কায়েম করেন।

৭১২ থেকে ১৫২৫ দীর্ঘ প্রায় আটশ' বছর। এ এক সোনালি ইতিহাসের সোনালি শৃঙ্খল। তারপর গৌরবময় ইতিহাসের আরেকটি যুগ। ইতিহাসে এটি মোগল যুগ নামে পরিচিত। মধ্য এশিয়ার সম্রাট জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর, তাঁর জীবনের দীর্ঘ বিজয়ের ধারা অব্যাহত রেখে ১৫২৬ ঈসায়ী অব্দে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ ছিল এক অলৌকিক বিজেতার দ্বারা এক অলৌকিক বিজয়। এ বিজয়ের ধারাবাহিক ইতিহাস স্বয়ং বাবর তাঁর 'বাবরনামা' নামক আত্মচরিতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বর্তমান লেখক যার বঙ্গানুবাদ 'বাবরনামা' নামে, সুদীর্ঘ ভূমিকাসহ সম্পন্ন করেছেন, যা ইতিপূর্বেই প্রকাশিত।

www.pathagar.com

বাবর তাঁর স্বপ্নের মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর, তাকে সুসংহত রূপ দেওয়ার আগেই পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান (১৫৩০ ঈ.)। তাঁর পর মোগল সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দীন মুহম্মদ হুমায়ূন। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাবর প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যকে সুসংহতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলার আগেই তাঁর সিংহাসনপ্রাপ্তির দশ বছরের মধ্যে বাবরের স্বপ্নের সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যায়। হুমায়ূনের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থিত হন শেরশাহ সূরি। তিনি মোগল সাম্রাজ্যের ঘরোহরের ওপর কায়েম করেন সূরি আফগান সাম্রাজ্য। শেরশাহ মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করতে পেরেছিলেন। তারপর, এক সামরিক দুর্ঘটনায় তিনি শহিদী মৃত্যুবরণ করেন। তারপর, তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীরা সুরী সাম্রাজ্যকে আরো দশ বছর মাত্র প্রলম্বিত করতে সমর্থ হন। তারপর, আবার ফিরে আসেন হৃত সাম্রাজ্যের মালিক মোগল সম্রাট হুমায়ূন। তারপর, মোগল সাম্রাজ্যকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি।

হুমায়ূন পুনরায় সাম্রাজ্য প্রাপ্তির পর আর বেশিদিন বাঁচেননি। তাঁর পিতা বাবরের মতোই তাঁকে নিতান্ত অকালে অসময়ে পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করে যেতে হয়। সাম্রাজ্যের হাল ধরতে হয় তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবরকে। যিনি 'আকবর দি গ্রেট' নামে বিশ্বখ্যাতি লাভ করেন তাঁর পূর্বপুরুষ বাবর-এ-আজম-এর মতো। তিনি প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন।

বাবর থেকে আকবর পর্যন্ত সময়কালে আকবরই মাত্র পূর্ণ বয়স লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন এবং সাম্রাজ্যকে প্রলম্বিত করেন। তাঁর পরে সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নূরউদ্দীন মুহম্মদ জাহাঙ্গীর। উল্লেখ্য যে, মোগল সম্রাটদের মধ্যে বাবরের পর আত্মচরিত লেখেন জাহাঙ্গীর। তাঁর চরিতকথার নাম 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী'– যার ফারসি নাম 'জাহাঙ্গীরনামা'। বর্তমান লেখক এ গ্রন্থেরও বঙ্গানুবাদ করেছেন। জাহাঙ্গীরের বয়স ও শাসন আকবরের মতো প্রলম্বিত হয়নি। তিনি আকবরের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম বয়সে মারা যান এবং তাঁর শাসনকাল মাত্র উনিশ বছর স্থায়ী হয়।

তাঁর পরে, সাম্রাজ্যের হাল ধরেন তাঁর মহিমান্বিত পুত্র আবুল মুজফফর মুহম্মদ শাহজাহান। তিনি এক মহিমান্বিত মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। তাঁর যুগকে ভারতের ইতিহাসের 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়। পাক-ভারত-বাংলা

www.pathagar.com

উপমহাদেশে স্থাপিত তাঁর সুশাসন ও স্থাপত্য-কলা, ভারতের ইতিহাসকে সুসমৃদ্ধ করে। জগদ্বিখ্যাত তাজমহল তাঁরই অমর কীর্তি। তিনি পূর্ণ বয়স লাভ করেন এবং দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন।

তারপর। তাঁর সুযোগ্য পুত্র, মোগল রাজর্ষি, মুহিউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব আলমগীর সাম্রাজ্য লাভ করেন। তিনি মোগল সম্রাটদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করেন এবং অর্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন। তাঁর শাসন ভারতের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ের সূচনা করে। যা পরবর্তী যুগের ভারতবর্ষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

সম্রাট শাহজাহান চোদ্দ সন্তানের জনক ছিলেন। তাঁর পত্নী আরজুমান্দবানু, যিনি মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর শাহজাহানের পরম প্রিয়তমা পত্নী ছিলেন, চোদ্দ সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁর সন্তানদের মধ্যে জাহানআরা ছিলেন সর্বজ্যেষ্ঠ। তাঁর দ্বিতীয় কন্যার নাম ছিল রওশনআরা। চার পুত্রের মধ্যে দারা ছিলেন জ্যেষ্ঠ, সুজা মেজ, আওরঙ্গজেব সেজ এবং মুরাদ ছিলেন ছোট। তাঁর কন্যাদ্বয়ের মধ্যে জাহানআরা তাঁর মহিমান্বিত গুণাবলির জন্য ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তিনি তাঁর অন্য পুত্রদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠিয়ে দিয়ে দারাকে কাছে রাখতেন। তিনি চাইতেন তাঁর পর দারাই মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সেসব প্রসঙ্গ পরে আসবে। তবে এখানে এ কথা স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া ভালো যে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' বীরের পায়েই নিজেকে সমর্পণ করে। সম্রাট-ভাগ্য দারার ললাট লিখন ছিল না, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তার পায়ে লুটিয়ে পড়েনি। প্রবল প্রতাপান্বিত আওরঙ্গজেবের পায়েই সে লুটায়। ফলে, 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা' কথাটি তাঁর কাছেই সার্থক হয়ে ওঠে।

এখানে স্পষ্টভাবে বলে নেওয়া আবশ্যক যে, তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবরের পর আকবরের মহান সাম্রাজ্যকে তিনিই সামলান এবং তা আরো ব্যাপক এবং বিস্তৃত করার কাজ নিজে সুচারুভাবে সম্পন্ন করার প্রয়াস চালান- যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

মুহম্মদ জালালউদ্দীন বিশ্বাস
চৈতা বিশ্বাসবাড়ি
বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

দুই.

আওরঙ্গজেব : জন্ম, বাল্য ও শিক্ষণকাল

সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজ মহলের তৃতীয় পুত্র মুহিউদ্দীন মুহম্মদ আওরঙ্গজেব ১৬১৮ ঈসায়ী সালের অক্টোবর মাসের ২৪ তারিখে বর্তমান বোম্বাই এলাকার পঞ্চমহল তহসিলের দাহোদ নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ওই সময়ে শাজহাজান দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ছিলেন। মোগল সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সঙ্গে অবনিবনার কারণে সে সময়ে তাঁকে অনেক বিড়ম্বনা সইতে হয়। ওই বিড়ম্বনার সময়ে আওরঙ্গজেবের বয়স ছিল মাত্র দুবছর। শাহজাহানের বিদ্রোহ ও বিড়ম্বনার কালে, যে সময়ে তিনি পিতা জাহাঙ্গীরের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন দারা ও আওরঙ্গজেবকে শর্তরূপে বন্ধক রাখা হয়। এই অবস্থায় আওরঙ্গজেবের কয়েকটি বছর কেটে যায়। কূটনীতিজ্ঞ নূরজাহানের সংরক্ষণে আওরঙ্গজেবের দিনগুলো কীভাবে অতিবাহিত হয় তার কোনো ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে, রাজনীতির জটিল আবর্তের মধ্য দিয়ে, একের পর এক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে শাহজাহান যখন সাম্রাজ্য লাভ করেন তখন আওরঙ্গজেব নয় বছর বয়স অতিক্রম করছিলেন। নয় বছর বয়স থেকে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বয়ঃকালের বিশেষ জানকারি সহজলভ্য নয়। তবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, অন্য শাহজাদাদের মতোই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়ে থাকবে। ওই যুগের রাজকুমারদের বাল্য ও শৈশব তথা শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়টি সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের বিষয় ছিল না। আওরঙ্গজেব সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য। তিনি তাঁর পিতার কাছে আগমনের পূর্বে কতটা শিক্ষা লাভ করেছিলেন সে সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে, ফারসি গ্রন্থাবলি থেকে তাঁর পরবর্তীকালের শিক্ষা-দীক্ষার অবস্থার কথা জানা যায়। তা হলো, একজন মুসলমানের যতটা শিক্ষা লাভ করার কথা তা তিনি সুচারুভাবে পেয়েছিলেন। তাঁর ধর্মশিক্ষার জন্য মোল্লা জীবন ও মোল্লা

www.pathagar.com

মুহম্মদ নামক দুজন মহাপণ্ডিতকে রাখা হয়েছিল। আফজল খাঁ ও আবদুল করিমও তাঁকে পড়াতেন।

পরবর্তীকালে, তথা তাঁর রাজত্বকালে আওরঙ্গজেব তাঁদের পাঁচ হাজারি মনসবদার পদে নিয়োগ করেছিলেন।

ইউনানি শাস্ত্রের সুপণ্ডিত মুহম্মদ হাসিমের কাছ থেকে তিনি ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যায় উত্তম জ্ঞান লাভ করেন। আওরঙ্গজেব ছিলেন তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন রাজপুত্র। যেকোনো বিষয় তিনি খুব দ্রুত আয়ত্ত করে নিতে পারতেন। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি উত্তমরূপে আরবি, ফারসি, তুর্কি ইত্যাদি ভাষা শিখে নিয়েছিলেন। তিনি খুব ভালো হিন্দি জানতেন এবং লিখতে, পড়তে ও বলতে জানতেন। তাঁর মৌলিক লেখার হাত ছিল অত্যন্ত সুন্দর। তিনি অতি উত্তম প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে পারতেন। ইচ্ছা করলে পূর্বপুরুষদের মতো আত্মজীবনী তিনিও লিখতে পারতেন। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, চিকিৎসাশাস্ত্র, ইসলামি তত্ত্বজ্ঞান ও জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। এ হিসেবে বলা যায় যে, আওরঙ্গজেব ভারতের আরো অনেক জ্ঞানী-গুণী বাদশাহদের অন্যতম ছিলেন। অত্যন্ত সুন্দর হস্তাক্ষরে পবিত্র কুরআন শরীফ লিখে তিনি মক্কা-মদিনায় পাঠাতেন। এসব গুণের অধিকারী হওয়ার ফলে দেশ-বিদেশে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি লেখালেখি করতে খুব পছন্দ করতেন। সুলেখক হওয়ার ফলে তিনি অত্যন্ত উচ্চস্তরের প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও অত্যন্ত মানসম্মত সুদীর্ঘ পত্র লেখায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বড় আমিরজাদা, সরদার, সুবাদার প্রমুখ রাজকীয় সেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের কাছে তিনি স্বহস্তে লিখিত পত্র পাঠাতেন। তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বিদ্যোৎসাহিতার পরিণামে তিনি বিদ্যা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হলেন, প্রজ্ঞাবান হলেন এবং সেই রঙে জীবন রাঙালেন।

আওরঙ্গজেবের বাল্যকালের একটি ঘটনা ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ওই ঘটনায় একদিকে যেমন তাঁর দৃঢ় মন-মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনই পাওয়া যায় তাঁর সাহসিকতার পরিচয়ও। ১৬৩৩ ঈসায়ী সালের কথা। আগ্রা কেল্লার বাইরে যমুনা নদীর তীরে, বাদশাহ শাহজাহান হাতির লড়াইয়ের একটি আসর বসিয়েছিলেন। হাতির লড়াই চলছিল। যুদ্ধজয়ী একটি হাতি মত্ত হয়ে সেই দিকেই ছুটে গেল যে দিকে শাহজাদারা ঘোড়ার পিঠে চড়ে হাতির লড়াই দেখছিলেন। সবাই ঘাবড়ে গিয়ে এদিক-ওদিক ছুট লাগালেন। কিন্তু মজবুত ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী আওরঙ্গজেব ডেটে রইলেন। মত্ত হাতিটি

www.pathagar.com

যেই মাত্র তাঁর দিকে ছুটে এলো তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁর হাতের ভালাটি নিয়ে হাতিকে আঘাত করলেন। তবে হাতিটি তাঁর ঘোড়াকে মারাত্মকভাবে আহত করল। আওরঙ্গজেব তাতেও দমলেন না। তিনি সাবধানতার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে পড়ে সেই ভালা দিয়ে হাতিকে পুনরায় আঘাত করলেন। এভাবে শাহজাদা ও হাতির মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এ ছিল এক রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি। শাহজাদার জীবন-মরণের প্রশ্ন ছিল। কিন্তু তাতে তিনি দমলেন না। এমন সময় অন্য লোকেরা ছুটে এসে হাতিকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল। কথিত আছে যে, সম্রাট শাহজাহান তাঁর পুত্রের এই বাহাদুরিতে এতটা খুশি ও প্রভাবিত হয়েছিলেন যে, পুরস্কার স্বরূপ তাঁর সম ওজনের সোনা প্রদান করেছিলেন। এ সময়ে আওরঙ্গজেব ছিলেন চোদ্দ বছরের কিশোর। এর পরেও, কার সন্দেহ থাকতে পারত যে, ইনি ভবিষ্যৎ-ভারতের মোগল সম্রাট হবেন না?

১৬৩৪ ঈসায়ী সালে আওরঙ্গজেব যখন ষোলো বছর বয়ঃক্রম অতিক্রম করেন তখন তাঁর পিতার পক্ষ থেকে তাঁকে দশ হাজার অশ্বারোহীর নায়ক পদ প্রদান করা হয়। ১৬৩৬ ঈসায়ী সালে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের সুবেদার করে পাঠানো হয়। তিনি সেখানে রাজনৈতিক চাতুর্য ও সফল কূটনীতিক রূপে যে শাসন কায়েম করেন তা ছিল বিস্ময়কর। এই সুবায় অবস্থান কালেই ১৬৩৭ ঈসায়ী সালে, শাহনওয়াজ খান বিন মির্জা রুস্তম সফলীর কন্যা দিলরাসবানু বেগমের সঙ্গে তাঁর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এক বছর পর, অর্থাৎ ১৬৩৮ ঈসায়ী অব্দে দিলরাসবানুর গর্ভে এক সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় জেব-উন-নিসা। ফারসি সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতীয় ফারসি কবিরূপে তিনি চির-স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর উপনাম ছিল 'মখান'। তাঁর কাব্য সংকলন 'দীওয়ান-এ-মখফী' নামে সুপ্রসিদ্ধ।

এতকাল তো ভালোই কাটছিল। প্রশাসনিক কাজকর্মে যে অসাধারণ যোগ্যতা তিনি দেখিয়ে চলেছিলেন, তার যথাযথ স্বীকৃতি সম্রাটের পক্ষ থেকে না পাওয়াতে তিনি বড়ই মনঃক্ষুণ্ন হলেন। এ হলো ১৬৪৪ ঈসায়ী সালের কথা। সম্রাট শাহজাহান আওরঙ্গজেবসহ তাঁর অন্য পুত্রদের দূর-দূরান্তের সুবাগুলোতে পাঠিয়ে দিয়ে জ্যেষ্ঠ পুত্র দারাকে নিজের কাছে রাখছিলেন। শাহজাহান দারাকে অত্যধিক ভালোবাসতেন। তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন পরবর্তী মোগল সম্রাট দারাই হোন। সেজন্য তিনি তাঁকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষিত করে তুলছিলেন। দারা পিতার মনোভাব বুঝে নিয়ে সুযোগ্য প্রশাসক

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের কাজে হস্তক্ষেপ করতে লাগলেন। আওঙ্গজেবের মনঃক্ষুণ্নতার এটাই কারণ বনে গেল। এভাবে আওরঙ্গজেবের মন বিষিয়ে উঠতে লাগল। তাঁর মধ্যে দারার প্রতি প্রবল ঈর্ষা, ক্রোধ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়ে গেল। আওরঙ্গজেব অত্যন্ত ধার্মিক প্রবৃত্তির মানুষ ছিলেন। এ সকল নানাবিধ কারণে রাজনীতি ও সুবেদারি থেকে আওঙ্গজেবের মন উঠে যেতে লাগল। অবশেষে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন দুনিয়াদারির ঝকমারি ছেড়ে তিনি ফকিরি জীবন অবলম্বন করবেন। তাঁর মন সংসার-বিবাগী হয়ে উঠল এবং ধর্মচিন্তায় ডুবে গিয়ে আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন হওয়াকেই নিজের জীবনের জন্য কল্যাণকর বলে মেনে নিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৪ বছর। পিতাকে পত্র লিখে সব বৃত্তান্ত তিনি জানিয়ে দিলেন এবং পশ্চিম ঘাটের একটি পাহাড়তলীতে ছোট্ট একটা কুটিরে থেকে ফকিরি জীবন যাপন করতে লাগলেন এবং জপতপ-সাধন-ভজন করতে লাগলেন। এ সবের পিছনে তাঁর কী উদ্দেশ্য ছিল তা জানা যায় না। কারণ, ঐতিহাসিকেরা এ সম্বন্ধে অনেক গড়বড় করে ফেলেছেন। কেউ কেউ বলেন যে, 'আসলে এ ছিল নাটক। জনসাধারণের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটানোর উদ্দেশেই এটা করা হয়েছিল। যাতে রাজ্য লাভের বিষয়টি গোপন থাকে। এ জন্য তিনি ত্যাগের লেবাস পরেছিলেন।' ঐতিহাসিকদের এ ধরনের মন্তব্যে যে সততার অভাব আছে তা এক প্রকারে স্পষ্ট। সন্দেহ বাতিকতা আসলে একটি মানসিক ব্যাধি। প্রকৃত সত্য অনুধাবনের জন্য চাই সত্য দৃষ্টি। এ কথা সকলেই জানেন যে, বহু জ্ঞানে জ্ঞানী এবং বহু গুণে গুণীদের জীবনের উদ্দেশ্য সফল করার জন্য ছল-কপটতার দরকার হয় না। আওরঙ্গজেব ছিলেন ধার্মিক, মনীষী এবং রাজর্ষি। তাঁর অধীত বিদ্যা ও অর্জিত গুণের যেকোনো একটি অবলম্বন করে সফলতার চূড়ান্ত শিখরে ওঠা সম্ভব ছিল। সে জন্য তাঁর এতসব ছল-কপটতার প্রয়োজন ছিল না। তা সত্ত্বেও তিনি যদি সম্রাট হয়ে থেকে থাকেন তাহলে বুঝতে হবে যে, সম্রাট পদ তাঁর পদচুম্বন করে তাঁর পদতলে আশ্রয় নিয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন ধার্মিক প্রবৃত্তির। যার ফলে সংসার বিবাগী হওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না। দ্বিতীয়ত, তিনি যদি তাঁর ভাইদের ঠকানোর উদ্দেশে এটা করে থেকে থাকেন তাহলে তিনি রাজকার্য ত্যাগ করতেন না। কিন্তু তিনি তা করেননি। তারপর, সম্রাট শাজহাজান যখন তাঁর এই ফকিরি গ্রহণের জন্য তাঁকে ভর্ৎসনা করেন এবং তাঁর আয়-রোজগারের পথ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেন তখনই তিনি পথে আসেন, ঘর-গৃহস্থালি স্বীকার করে নেন এবং নতুন করে রাজকার্য সামলাতে থাকেন। অতএব, ফকিরির পোশাক ধারণ ছিল লোক দেখানো, এসব কথার আর সারবত্তা থাকে না।

www.pathagar.com

অবশ্য, এ কথাও ঠিক যে, যৌবনে মানুষের মধ্যে বিচিত্র খেয়াল জেগে ওঠে এবং সময়টিও বড় বিচিত্র হয়ে ওঠে। যৌবনে মানব-মনে নানা রকমের এবং নানা রঙের তরঙ্গ উত্থিত হয়, সে সবের বর্ণনা এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে, এটা হতে পারে যে, আওরঙ্গজেবের হৃদয় সাগরে এরকম কোনো তরঙ্গ উত্থিত হয়ে থেকে থাকবে, তবে সে জোশ স্থায়ী না হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে থাকবে।

এর অল্পকাল পরে, ১৬৪৭ ঈসায়ী সালে শাহজাহান পূর্বপুরুষদের আমলে বিজিত, একদা হৃত প্রদেশগুলোকে পুনর্বিজিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং যথারীতি সে দায়িত্ব তাঁর সুযোগ্য পুত্র আওরঙ্গজেবকেই অর্পণ করেন। মধ্য এশিয়ায় এক বিশাল সৈন্যসহ আওরঙ্গজেব অভিযান চালিয়ে এক বিরাট বিজয় সম্পন্ন করেন। তবে, রাজধানী থেকে এত দূরের প্রদেশ হওয়ায় এবং তার ওপর অধিকার কায়েম রাখা সুকঠিন প্রতীত হওয়ায় তিনি সন্ধি করে নেন। এরপরই, শাহজাহান তাঁর পূর্বপুরুষদের বিজিত রাজ্য কান্দাহার পুনরাধিকারের জন্য আওরঙ্গজেবকেই মনোনীত করেন এবং শাহি ফরমান জারি করেন। তিনি যথারীতি সেখানকার বেগ শাসকের ওপর আক্রমণ চালিয়ে দেন। শাসক পরাজিত হয়ে সন্ধি করে নিলেন। আওরঙ্গজেব প্রত্যাবর্তন করলেন। এই যুদ্ধে তিনি খুবই লাভবান হন। তাঁর সৈন্যরা আওরঙ্গজেবের রণকৌশল, কূটনৈতিক প্রজ্ঞা এবং দীন-ধর্মের প্রতি অবিচল আস্থা দেখে গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তাঁর প্রতি তাদের অপার শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও ভালোবাসা বেড়ে যায়। ভয়ংকর যুদ্ধের সময়ে, নামাজের সময় এসে গেলেও তিনি সরাসরি ময়দানে দাঁড়িয়ে অবিচল চিত্তে নামাজ পড়ে নিতেন। যা একজন সত্যিকারের গাজি বীরের চরিত্র ছিল। মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজির মর্যাদা জগতে ইসলামই একমাত্র তাদের দিয়েছে, যারা জগতে এক আল্লাহ ছাড়া কারো কাছেই মাথা নত করেন না। তাঁর মতো মুসলিমরাই বলতে পারতেন এই কথা, মহাকবি ইকবালের কণ্ঠে যা ধ্বনিত হয়েছে—

'যুদ্ধের আগে নামাজ এলেও আমরা আগেই পড়েছি নামাজ।
সামনে রেখেছি হারাম শরীফ পিছনে রেখেছি অনাম হিজাজ ॥'

আওরঙ্গজেব ছিলেন সেই গাজি, সেই বীর, যিনি তাঁর কর্তব্যকর্ম থেকে কখনো বিচ্যুত হননি। এর দ্বারা তাঁর প্রতিপক্ষও প্রভাবিত হয়ে পড়ত, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাভাবে তারা নুয়ে পড়ত। তাদের মনে হতে থাকত 'আল্লাহর ফেরেশতা'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়লাভ অসম্ভব ব্যাপার।

www.pathagar.com

কান্দাহার থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আওরঙ্গজেবকে দাক্ষিণাত্যে আবার ফিরে যেতে হলো। এই সময়টি তাঁর জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। ফিরে এসে তিনি ব্যাপকভাবে সামরিক সংস্কার করলেন। তাঁর বাহিনীর যথারীতি আধুনিকীকরণ করলেন। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার মধ্যে বারবার ঝগড়া-অশান্তি-যুদ্ধবিগ্রহ হওয়ার সুবাদে আওরঙ্গজেব নিজের যোগ্যতা, দক্ষতা, কূটনৈতিকতা, সৈন্যাপত্য ও বীরত্ব প্রদর্শনের উপযুক্ত অবসর পেয়ে গেলেন। তিনি তাঁর কূটনৈতিক দক্ষতা ও চাতুর্য দেখিয়ে গোলকুণ্ডার যোগ্য মন্ত্রীকে নিজের পক্ষে টেনে নিলেন এবং সম্রাটের কাছে সুপারিশপত্র পাঠিয়ে তাঁকে প্রথম শ্রেণির দলপতির মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করালেন। এ অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন দলপতি, অত্যল্পকালমধ্যেই মোগল সাম্রাজ্যের একজন দৃঢ় স্তম্ভ বলে পরিগণিত হয়ে গেলেন। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, যোগ্য ব্যক্তির যোগ্যতা নিরূপণ এবং তাকে যথারীতি চিনে নেওয়ার যোগ্যতা ও উপযুক্ত পদে বসানোর মতো জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি ছিল আওরঙ্গজেবের মজ্জাগত।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যেই তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, কূটনৈতিক দক্ষতা, রণক্ষেত্রে নেতৃত্বের দক্ষতা ও অন্য সকল প্রকারের যোগ্যতার যথাযথ পরিচয় দিয়ে নিজেকে সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বরূপে তাঁর পরিচয় গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। শাহজাহানের পুত্রদের মধ্যে এ পরিচয় এই যোগ্যতা আর কেউ তুলে ধরতে সমর্থ হননি। এ প্রসঙ্গে একটু পিছনে তাকালে একটা সত্য সুস্পষ্টরূপে চোখের সামনে ভেসে উঠবে। তা হলো, আওরঙ্গজেব তাঁর ভাইদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। তাঁর পিতা শাহজাহানও তাঁর ভাইদের মধ্যে তৃতীয় ছিলেন। শাহজাহানও তাঁর ভাইদের মধ্যে সর্বাধিক যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে খুররম থেকে শাহজাহান হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরবর্তী মোগল সম্রাটরূপে জনমনে স্থান পেয়ে গিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবও পিতার মতোই অসাধারণ রাজনৈতিক জ্ঞান, প্রজ্ঞা, মনীষা ও মেধার পরিচয় দিয়ে পরবর্তী মোগল সম্রাটরূপে জনমনে ঠাঁই পেয়ে গিয়েছিলেন। তকদির-ললাট লিখন তাঁদের ললাটে রাজটীকা এঁকে দিয়েছিল। যে যা-ই বলুন, সম্রাট শাহজাহানের ন্যায় বিচক্ষণ সম্রাট, দারার প্রতি যতই দুর্বল থাকুন না কেন, আওরঙ্গজেবের যোগ্যতাকে অস্বীকার করার মতো মূঢ় তিনি ছিলেন না। তিনি জানতেন এবং সবাই জানেন যে, রণক্ষেত্রে সুকুশল নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা, জয় ছিনিয়ে আনার মতো যোগ্যতা, রাজনৈতিক-কূটনৈতিক প্রজ্ঞা— এসব আওরঙ্গজেব ছাড়া শাহজাহানের আর কোনো পুত্রের মধ্যে ছিল না।

কথিত আছে, সম্রাট শাহজাহান একবার তাঁর উজিরে আজমকে পালাক্রমে তাঁর চার পুত্রের কাছে পাঠিয়েছিলেন তাঁদের রাজনৈতিক যোগ্যতা ও বিচক্ষণতার পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। প্রশ্ন ছিল, দেশের কোন বাজারে দ্রব্যমূল্যের অবস্থা কেমন। এঁদের মধ্যে আওরঙ্গজেব তাঁর প্রশ্নের জবাবে যা বলেছিলেন, তাতে তিনি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব দেশের

www.pathagar.com

দুএকটা নয়; অন্তত দশটি প্রধান বাজারের সোনা-চাঁদিসহ খাদ্য-দ্রব্যের মূল্যমানের এক দীর্ঘ ফিরিস্তি তুলে ধরেছিলেন। এতে প্রশ্নকর্তা বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং যথারীতি সে সংবাদ তিনি সম্রাটকে জানিয়েছিলেন।

আরো একটি ঘটনার কথা জানা যায়। তাঁরা চার ভাই একবার সাম্রাজ্যের এক মহান ওলির কাছে গিয়েছিলেন সম্রাট হওয়ার কামনা নিয়ে। ওলি তখন ঘুমুচ্ছিলেন। চার ভাই তাঁর নিদ্রাভঙ্গের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁদের কেউ বসেছিলেন তাঁর মাথার কাছে, এই ভেবে যে, যেহেতু মাথা শরীরের প্রধান অঙ্গ, সেহেতু তিনি তাঁকেই সম্রাট হওয়ার আশীর্বাদ দেবেন। কেউ বসলেন ওলির পায়ের দিকে, যাতে ঘুম ভেঙেই তিনি তাঁকেই দেখতে এবং সেরা আশীর্বাদটি তাঁকেই দেন। আরেক জন বসলেন দরজার দিকে, যাতে দরজার দিকে তাকালেই তাঁকে দেখতে পান এবং সম্রাটের আশীর্বাদটি তাঁকেই দেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব বসলেন তাঁর খাস আসনটিতে। ওলির ঘুম ভাঙল। তিনি দেখতে পেলেন চার শাহজাদাকে। শাহজাদাগণ তাঁদের কামনা জানালেন। তিনি মুচকি হাসলেন। তারপর বললেন, তোমরা তো স্ব-স্ব ভাগ্য নিজেরাই নিরূপণ করে নিয়েছ।

এর দ্বারা সহজেই বোঝা যায় যে, ভাগ্য ও যোগ্যতা কারো ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়ার বস্তু নয়। সম্রাট যার হওয়ার কথা তা ছিল বিধি নির্দিষ্ট। তা সত্ত্বেও কথা রয়ে যায়। আর সে জন্যই ক্ষমতা নিয়ে এত দ্বন্দ্ব, রক্তারক্তি, হানাহানি।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের দিনগুলো ভালোই কাটছিল। চারদিকে শান্তি বিরাজ করছিল। মানুষের মধ্যে শান্তি-স্বস্তি সমানে বিরাজ করছিল। কেননা, শাহজানের যুগ ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। কিন্তু 'চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়'। সম্রাট শাহজাহান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সে খবর হাওয়ার বেগে ছড়িয়ে পড়ল। যথারীতি সে খবর আওরঙ্গজেবও পেয়ে গেলেন। এ খবর শুনে আওরঙ্গজেবের হৃদয়-মন অস্থির হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর প্রাণ কেঁপে উঠল।

১৬৫৭ ঈসায়ী সালের কথা। হাকিম ও বৈদ্যরা তাঁর বাঁচার আশা ছেড়ে দিলেন। এ সময়ে সম্রাটের পুত্রগণ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সুবেদারি সামলাচ্ছিলেন। তাঁর বড় আদরের জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্রাটের কাছেই থাকতেন এবং হাতে-কলমে সাম্রাজ্য শাসনের সবক নিচ্ছিলেন। সেই সাথে সাম্রাজ্যের ফরমানসহ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের দায়ভার দারাই সামলে আসছিলেন। দ্বিতীয় পুত্র

www.pathagar.com

সুজা বাংলার, মুরাদ গুজরাটের এবং আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের সুবেদারির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠ ও আদরের পুত্র দারা যে শুধু কেন্দ্রীয় প্রশাসনে সম্রাটের ডান হাত হয়ে বিরাজ করতেন তা নয়; বরং তিনি সম্রাটের সকল কাজেই পরামর্শদাতার কাজ করতেন এবং তা হতে হতো তাঁর নিজের ইচ্ছামাফিক।

দারাও তাঁর কর্মকাণ্ডকে 'পুত্রধর্ম' জ্ঞান করে সম্রাটের সাথেই কাজ করতেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে নীরবে কাজ করে যেতেন। এদিকে সম্রাটের অসুস্থতাকে তাঁর মৃত্যু মনে করে তিনি রাজক্ষমতা হাতিয়ে নেওয়ার উপায় খুঁজতে লাগলেন। যেহেতু তিনি সম্রাটের কাছে-কাছেই থাকতেন সেহেতু তিনি মনে করেই নিয়েছিলেন যে, পরবর্তী মোগল সম্রাট তিনিই হবেন। বাস্তবে 'রাজ্য লোভ বড় লোভ।' এতে তিনি এতটাই নিমগ্ন হয়ে গেলেন যে, তিনি চালবাজির আশ্রয় নিতে লাগলেন। সম্রাট-পিতার প্রকৃত অবস্থা তিনি গোপন করতে লাগলেন। দূর-দূরান্তের রাজ্যগুলো থেকে আসা ভাইদের দূতদের সম্রাটের নিকট পর্যন্ত পৌঁছাতে না দিয়ে এবং বাদশাহর নামে লেখা পত্রাবলির নিজের মনগড়া জবাব লিখে আবার পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। এ ছিল স্পষ্টতই মিথ্যার আশ্রয়। পরিণাম হলো উল্টো। বাংলায় প্রবাদ বাক্য আছে 'কুঁয়ো কার জন্য খুঁড়ছ, নিজের কুঁয়োয় নিজে পড়বে।' সম্রাটের অসুস্থতার খবর ছড়াতে ছড়াতে এক পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ল যে, সম্রাটের মৃত্যু হয়ে গেছে এবং দারা সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছেন।

www.pathagar.com

দারার ভুলভ্রান্তি ও গুণ-দোষ

বাদশাহ অসুস্থ হয়ে পড়লে দারা সাম্রাজ্যের লাগাম নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আর তিন ভাইকে বাদশাহর সঠিক অবস্থার কথা জানতে দেননি। তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে ষড়যন্ত্র ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে যাচ্ছিলেন। পরিণাম হলো অত্যন্ত ভয়াবহ। যা ধারানুক্রমিকভাবে বর্ণিত হবে।

ওই সময়ে দারার বয়স ছিল ৪৩ বছর।

তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী। কিন্তু মুখের মিষ্টতার সাথে সাথে আভ্যন্তরিক তিক্ততাও ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। তিনি খুব দ্রুত মেজাজ হারিয়ে ফেলতেন। আবার ছিলেন ক্রোধী স্বভাবের। একজন সম্রাটের যে গুণটি অবিচ্ছেদ্য বলে গণ্য হয়ে থাকে তা হলো কোমল ও কঠোরের সঠিক মাত্রার সন্তলন। তাঁর চরিত্রে এর অভাব ছিল। তবে তিনি স্বভাবগতভাবে উদার ছিলেন। তাঁর মধ্যে রাজসিক রুচি ও মানসিকতার আলাদা ঝলক ছিল। তা ছিল এক মানসিক বিষয়। কিন্তু সম্রাট সুলভ উদারতা ভিন্ন বস্তু। কেননা, সাম্রাজ্যের ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে প্রজাদের ওপর দরদ ও ভালোবাসার জন্য যে সাম্যবাদী মন-মানসিকতা ও ন্যায়পরায়ণতার অসাধারণ গুণ থাকা প্রয়োজন তার অভাব দারার মধ্যে ছিল। তাঁর পূর্ব-সম্রাট জালালউদ্দীন মুহম্মদ আকবরের উদারতা তাঁর মধ্যে ছিল, ধর্মীয় উদারতার বিষয়ে বোধহয় তিনি আকবরকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মধ্যে মুসলিম সুলভ ধর্মপরায়ণতার অভাব ছিল বলেই মনে করেন অনেকে। হিন্দু-খ্রিস্টান ইত্যাদি ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে পরিমাণে মুসলিম-বিদ্বেষী মনোভাব কাজ করত, তার বিপরীতে তাঁর মনোভাবকে সিয়া-সুন্নি মুসলিমরা ভালো চোখে দেখতে পারেননি। ফলে, দারার প্রতি তাঁর মুসলিম সাম্রাজ্য ততটা প্রসন্ন ছিল না। এই অপ্রসন্নতা থেকেই দারা-বিরোধী মনোভাব তাদের মধ্যে তুষের আগুনের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। ফলে, তাঁকে যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।

www.pathagar.com

উচ্চশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত দারা বেনারসে গিয়ে আচ্ছামতো সংস্কৃত শিখেছিলেন। আরবি-ফার্সি-উর্দু-হিন্দি-সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত দারা তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্রেও ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন। হিন্দু পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণদের সংস্পর্শধন্য দারা অনেক ব্রাহ্মণকে রাজসিক অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। কথায় কথায় তিনি তাঁদের রাজকীয় পুরস্কার, জায়গিরি ইত্যাদি দিয়ে তাঁদের সন্তুষ্ট করে রেখেছিলেন। ফিরিঙ্গি ও খ্রিস্টানদের সঙ্গেও তিনি অত্যন্ত সদ্ভাব রাখতেন। এটা বহু মুসলমানের মনক্ষুণ্নতার কারণ ছিল। কারণ, ওই সকল পোড় খাওয়া মুসলিমরা জানতেন রাজকীয় সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া ওই বিধর্মীরা সামনে তাঁকে বন্দনা করে বটে কিন্তু তার আড়ালে তারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। এসব তিনি দেখেও দেখতেন না, বুঝেও বুঝতেন না। মুসলিম ঐতিহাসিকেরা এ বিষয়ে মত দেন যে, দারার এসব কর্মকাণ্ড ছিল রাজ্য লাভের একটা ঢং। কিন্তু তিনি কি জানতেন যে, তার ভবিষ্যৎ কত ভয়ারহ হতে পারে?

তাঁর ওপর বাদশাহর বড়ই কৃপা ছিল এবং তিনি তাঁকে 'শাহ বুলন্দ ইকবাল' (রাজ্যের উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আমির) খেতাবে ভূষিত করেছিলেন। এমনও কথিত আছে যে, শাহজাহান তাঁকে পঞ্চাশ হাজার টাকা মূল্যের হীরা-মতি সজ্জিত একখানি আংরাখা দিয়েছিলেন। বাদশাহর কাছে দারা ব্যতীত আর কারোরই বসার কোনো হক ছিল না। শুধু তাই নয়; বরং বাদশাহর ডান পাশে দারার উপবেশনের জন্য একটি বিশেষ আসন— যাকে ছায়া সিংহাসন বলে অভিহিত করা যায়, রাখা হতো। দারার প্রতি সম্রাটের এই বিশেষ ব্যবহারের ফলে জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ়মূল হয়ে গিয়েছিল যে, ভারতের ভাবী সম্রাট দারাই।

কিন্তু এর বিপরীত চিত্র ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। কিছু মানুষ দারাকে ভাবী মোগল সম্রাট ভাবলেও ললাট লিখনের ভাষা ও সাম্রাজ্যের বৃহত্তম জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল ভিন্ন। রাজ্যের আমির-উমরাহ থেকে শুরু করে ছোট-বড় সকল সেনাপতি, সরদার ও আপামর জনগণের মনে ছিল একটাই নাম— আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেব ইতিমধ্যেই রণক্ষেত্রে রণকুশলতা, রাজনীতি ক্ষেত্রে যে রাজবিজ্ঞতা, কূটনীতি ক্ষেত্রে যে কূটনীতিজ্ঞতা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যে সকল দক্ষতা দেখিয়ে নিজের যোগ্যতার কীর্তিস্তম্ভ তিনি স্থাপন করেছিলেন, তা থেকে একটা ইটও খসার কোনো উপায় ছিল না।

www.pathagar.com

এতসব গুণমান ও যোগ্যতার পরিচয় দান করার পর জনমনে তাঁর যে প্রতাপ ও রবদবা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল তা থেকে তাঁকে কে পারত বিচ্ছিন্ন করতে? তা ছাড়া তিনি ছিলেন ভাষাবিদ ও ধর্মতত্ত্ববিদ মহাপণ্ডিত। পবিত্র কোরআনের জ্ঞানে জ্ঞানী, ইসলামের শরিয়তি জ্ঞানের জ্ঞাতা, ইসলামি দীনের রঙে রঞ্জিত, সকলের নয়নের মণি ছিলেন আওরঙ্গজেব। তখন তাঁর বয়স ছিল ৪০ বছর। সহজ-সরল জীবনাচরণে অভ্যস্ত, দূরদর্শী, যুক্তিতর্কতত্ত্ব ও তথ্যজ্ঞানে অদ্বিতীয় আওরঙ্গজেব হয়ে উঠেছিলেন রাজর্ষি। কোনো রাজাকে যদি রাজর্ষি উপাধি দেওয়া হয়, কোনো রাজা যদি যথার্থ রাজর্ষি পদমর্যাদা লাভের অধিকারী হন, তবে তিনি আওরঙ্গজেব। কোনো রাজাকে কেউ যদি রাজর্ষি রূপে দেখতে চান তিনি আওরঙ্গজেবকে দেখুন। প্রখ্যাত ইংরেজ লেখক ওউভিংটন যথার্থই লিখেছেন, 'তিনি ন্যায়ের মহাসাগর ছিলেন।' মনুষ্যচরিত্র অনুধাবনে কুশল, আওরঙ্গজেব ছিলেন কঠোর পরিশ্রমী, কঠিন হতেও কঠিনতর দুঃখকষ্ট সইবার মতো ইস্পাত কঠিন শক্তির অধিকারী, দৃঢ়চেতা এক মহান ব্যক্তিত্ব। এ সকল দুর্লভ গুণের অধিকারী হওয়ার কারণে প্রজাকুল তাঁকে তাঁর অন্য ভাইদের চেয়ে রাজা হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি বলে মানতেন। শুধু তাই নয়, আমির-উমরা-সেনাপতি-সরদারদের মতোই প্রজারাও 'কাফির দারা'-কে ক্ষমতাসীন হতে না দেওয়াকে নিজেদের পবিত্র ধর্ম বলে জ্ঞান করতেন।

সুজার ধর্মবিশ্বাসও অনেক ঢিলেঢালা ছিল। সম্রাট শাহজাহান কট্টর সুন্নি মুসলিম ছিলেন। তেমনই কট্টর সুন্নি ছিলেন আওরঙ্গাজেবও। তবে তিনি পরজাতি ও পরধর্মবিদ্বেষী ছিলেন না। সুজা সম্বন্ধে কথিত যে, তিনি শিয়া মত গ্রহণ করেছিলেন। মোগল রাজবংশে শিয়া-সুন্নি উভয় মতের লোক থাকলেও মোগল সম্রাটগণ নিজেরাই ছিলেন সুন্নি। এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো সন্দেহ-অবিশ্বাস-ঢিলেমি ছিল না। মোগল অমাত্যকুল প্রধানত সুন্নি মতাবলম্বী হওয়ায়, শিয়া মতাবলম্বীদের রাজকার্যে গভীর প্রভাব থাকতে পারেনি। যার ফলে, অপেক্ষাকৃত সুন্নি ধারণার সঙ্গে শিয়া-ধারণার দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হলে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব হতো না।

শুজার বিষয়ে মোগল অমাত্য তো বটেই, প্রজাকুলও সবিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না, প্রধানত ধর্মীয় ভাবধারার প্রশ্নে। ইতিমধ্যে আওরঙ্গজেব ও মুরাদের মধ্যে সহমত গড়ে উঠেছিল যে, সুজাকে কোনো অবস্থাতেই সম্রাট পদে মেনে নেওয়া হবে না। যার ফলে, তাঁরা সেই প্রয়াসেই লেগে রইলেন।

www.pathagar.com

ওই সময়ে সুজার বয়স ছিল ৪১ বছর। তিনি বড়ই বিচিত্র স্বভাব-প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মদিরা প্রিয় মানুষ। এ ছাড়া তিনি ছিলেন বড়ই আরামপ্রিয়। এমন ব্যক্তি যে সম্পূর্ণ অযোগ্য প্রতীত হয় ইতিহাসে তার অসংখ্য প্রমাণাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনাপত্য করার বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না। এমন মানুষের পক্ষে দৃঢ়চেতা হওয়াই সম্ভব নয়। যাই হোক, তাঁর নিজের সাধনা ও নিজের জীবনের আমলের প্রভাব তাঁর নিজের উপরেই পড়েছিল। ফলে, তাঁর জীবন অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

সর্বকনিষ্ঠ মুরাদ বখশ এমনিতেই ঠিক ছিলেন। সুজার একেবারেই বিপরীত এবং আওরঙ্গজেবের কাছাকাছি। যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার এবং সুবেদারি সামলানোর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতাও তাঁর ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে জান লড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধ করার যোগ্যতাও তাঁর ছিল। তিনি একজন দক্ষ শিকারি ছিলেন। নিখুঁত লক্ষ্যভেদ করার বিষয়ে তাঁর সুনাম ছিল। তিনি একজন প্রথম শ্রেণির ঘোড়সওয়ার ছিলেন। তিনি ছিলেন উদারতা ও দয়াগুণে গুণান্বিত এক মহান ব্যক্তি। কিন্তু তাঁর এসব শ্রেষ্ঠ গুণ কলঙ্কিত করে দিয়েছিল তাঁর মদিরাপ্রিয়তা। যা একজন মুসলমানকে কলঙ্কিত করে এবং তার সদ্‌গুণাবলিকে ধ্বংস করে দেয়। উল্লেখ্য যে, ইসলাম মদ হারাম বা নিষিদ্ধ করেছে বহুকাল আগেই, মহানবি (সা.)-এর জীবৎকালেই। পবিত্র কুরআনে যা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত রয়েছে। সুতরাং মুরাদের এতসব গুণা থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতের মতো এক বিশাল দেশের সম্রাট হওয়ার ক্ষেত্রে নিজের অজান্তে নিজেকে অযোগ্য প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ সকল পর্যালোচনা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, সবার উর্ধ্বে, সবার ওপর, একজন যোগ্য হতেও যোগ্যতর ব্যক্তিরূপে আওরঙ্গজেব নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন— সুতরাং তিনিই যে ভারতবর্ষের সম্রাট হবেন এতে তার কোনো সন্দেহ ছিল না।

শাহজাহানের অসুস্থতার খবর ছড়িয়ে পড়ায় তাঁর পুত্রদের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। প্রত্যেকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সিংহাসন লাভ আর সম্রাটত্ব লাভ।

সুজা বাংলা থেকে সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। এদিকে মুরাদ সেনা চালিয়ে দিলেন গুজরাট থেকে একই উদ্দেশে। তিনি তো নিজেকে প্রকাশ্যে এবং সরাসরি পরবর্তী মোগল সম্রাট ঘোষণা করে দিলেন এবং উপাধিও ধারণ করলেন। এদিকে আওরঙ্গজেবও সসৈন্যে দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

দারাও বসে রইলেন না। তিনি একটি নয়; বরং দুটি বাহিনী একত্রিত করলেন। একটির নেতৃত্ব পুত্র সুলেমান ও অন্যটির নেতৃত্ব মির্জা রাজা জয়সিংহের হাতে দিয়ে সুজাকে পরাজিত করে তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার আদেশ দিয়ে পাঠালেন। অন্য বাহিনীকে মহারাজা যশবন্ত সিংহ ও কাসিম খানের নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন আওরঙ্গজেব ও মুরাদের যৌথ বাহিনীর বিরুদ্ধে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা সুজার ছিল না। ওই কঠোর, কঠিন পরিবেশ-পরিস্থিতির মুখোমুখি হতেই তাঁর জোশ উড়ে গেল। কুশল নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা তো ছিলই না, পরন্তু সুলেমান ও জয়সিংহের যৌথবাহিনীর মুখোমুখি হতেই তিনি সাহস হারালেন। বলাবাহুল্য, বাহাদুরপুর গ্রামের কাছে সংঘটিত সংক্ষিপ্ত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে তিনি বাংলা অভিমুখে পালিয়ে গেলেন। ইতিমধ্যে কুশলী, কূটনীতিজ্ঞ ও উচ্চস্তরের সামরিক ব্যক্তিত্ব ও সেনাপতি আওরঙ্গজেব নিজের প্রস্তুতি মজবুত করে নিলেন। তিনি নীতি নির্ধারণ করতে পারতেন, ধীর-স্থিরভাবে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন এবং নিজের লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ ও পদ্ধতি স্থির করতে পারতেন। তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ গুণ এই ছিল যে, তিনি নিজের মনের কথা নিজের আয়ত্তে রাখতে পারতেন। নিজের মনের কথা তিনি কখনো কাউকে জানতে দিতেন না। ফলে, তাঁর কাছাকাছি থাকা লোকেরাও তাঁর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথা জানতে পারত না। সর্বোপরি, তাঁর মনের নাগাল কেউ পেত না। ওদিকে অসাধারণ সামরিক ব্যক্তিত্ব ও কুশলী রাজনীতিক এবং উন্নত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন আওরঙ্গজেবের হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত থাকত তাঁর অধীনস্থগণ। এই যেখানে বাস্তবতা, সেখানে কে পারত তাঁর স্থান থেকে তাঁকে হটাতে?

'পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রাখো, সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলো, সমস্ত পরিকল্পনা গোপন রাখো, কূটনৈতিক চাল প্রয়োগ করে সবাইকে নিজের পক্ষে রাখো এবং নিজের লক্ষ্য হাসিল করো'— এই ছিল আওরঙ্গজেবের নীতি। তিনি মুরাদকে গুপ্ত পত্র মারফত বুঝিয়ে দিলেন যে, 'কাফির দারা ও সুজা'-কে সিংহাসনে বসতে দেওয়াটাকে তিনি সঙ্গত বলে মনে করছেন না। তাঁর ইচ্ছা যে, সিংহাসনে মুরাদই বসুন। এ আসনে তিনিই উপযুক্ত। তাঁর ইচ্ছা যে, উপযুক্ত এবং যোগ্য ব্যক্তিই সিংহাসনের উপযুক্ত। বিশেষ করে তিনি একথাও লিখলেন যে, মুরাদকে সিংহাসনে বসিয়ে তিনি নিজে সংসার ত্যাগ করে ফকিরি অবলম্বন করবেন এবং ত্যাগী ফকিরির জীবন গ্রহণ করবেন।

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের এই প্রবোধপূর্ণ ভাষণে মুরাদ ফেঁসে গেলেন। আসলে, রাজনৈতিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও কূটনৈতিক চাল বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ-সরল মানুষের কাজ নয়। এ সকল জ্ঞান-প্রজ্ঞা মুরাদের ছিল না। বিষয়টা যেখানে ছিল রাজনৈতিক কূটনৈতিক চাল চালাচালি, সর্বোপরি, যা ছিল বিশুদ্ধরূপে ক্ষমতা দখলের লড়াই, দুর্বলচিত্ততার কোনো জায়গা সেখানে ছিল না। রাজনৈতিক জ্ঞান-পণ্ডিত্য-মনীষা-মেধা-প্রজ্ঞায় যিনি ছিলেন সর্বোপরি, রাজনীতির কুটিল আবর্তের পথ ধরে ক্ষমতা তার পায়ে এসেই লুটিয়ে পড়ার কথা ছিল। রাজনৈতিক-কূটনৈতিক জ্ঞান-প্রজ্ঞা রহিত দুর্বলচিত্ত মুরাদ স্পষ্টই ফেঁসে গেলেন আওরঙ্গজেবের প্রবোধে। ফলে, যা হবার তাই হলো। মুরাদ আওরঙ্গজেবের পক্ষ হয়ে দারার বিরুদ্ধে লড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। অর্থাৎ আওরঙ্গজেব মুরাদকে নিয়ে দারার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেললেন। মুরাদকে সাথে নিয়ে আওরঙ্গজেব অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠলেন।

পরবর্তী মোগল সম্রাট হওয়ার স্বপ্নে বিভোর মুরাদ এক প্রকারে ফকিরির ইচ্ছা প্রকাশকারী ভাই আওরঙ্গজেবের কাছে সসৈন্যে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেন। বলাবাহুল্য, আওরঙ্গজেবকে সাহায্য করার জন্য সসৈন্যে এগিয়ে চললেন। যশবন্ত সিংহ এ খবর পাওয়া মাত্রই মুরাদের রাস্তা অবরোধ করার জন্য উজ্জৈন থেকে প্রস্থান করলেন। পথিমধ্যে তিনি আওরঙ্গজেবের নর্মদা পর্যন্ত আগমনের খবর পেলেন। তখন তিনি মুরাদের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে নর্মদা অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। এ সময় কিছু রাজপুত সরদার ও আওরঙ্গজেবের মধ্যে ভয়ংকর যুদ্ধ হলো। আওরঙ্গজেবের মতো কুশল সেনাপতি ও যোদ্ধার সঙ্গে এ যুদ্ধে জয়লাভ করা একটা অসম্ভব ব্যাপার ছিল। যুদ্ধজয়ী আওরঙ্গজেবের সাথে ইতিমধ্যেই মুরাদ এসে মিলিত হলেন এবং তিনি যশবন্ত সিংহের ফৌজের রসদ সামগ্রী লুট করে নিলেন। যশবন্ত সিংহ তাঁর প্রভুভক্ত রাঠোর সিপাইদের নিয়ে যোধপুরের দিকে চলে গেলেন।

এই যুদ্ধে আওরঙ্গজেবের যশ অনেক বেড়ে গেল। শুধু তাই নয়, বাস্তবতা এমন হলো যে, আওরঙ্গজেবকে 'জগৎজয়ী' বলে মানা হতে লাগল। তাই বা কেন না হবে, ওই সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করার মতো কোনো ব্যক্তি বা শক্তি ভারতে ছিল না।

আওরঙ্গজেবের বিজয়ডঙ্কা তারস্বরে বাজতে লাগল। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা তাঁর পদতলে এসে স্থির হয়ে যেতে লাগল। তাঁর শাহি তকদির তাঁকে জানিয়ে

www.pathagar.com

ও বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, আগামী ভারত-সম্রাট তুমিই। ভবিষ্যতের ভারত শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতির জন্য তোমারই মুখাপেক্ষী।

আওরঙ্গজেবের বিজয়ী বাহিনী এবার গোয়ালিয়রের উদ্দেশে প্রস্থান করল এবং চম্বল নদীর কিনারে এসে শিবির ফেলল। সম্পূর্ণ নতুন পরিকল্পনা ও সুদৃঢ় পদক্ষেপ নিয়ে তাঁর বাহিনী অনতিবিলম্বেই আগ্রার উদ্দেশে প্রস্থান করল। এই পথেই দারা সসৈন্যে সামুগড়ে শিবির ফেলে শত্রুবাহিনীর পথ রোধ করার জন্য অবস্থান করছিলেন।

www.pathagar.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সামুগড়ের যুদ্ধ ও আওরঙ্গজেবের বিজয়

সংখ্যার জোরে যে যুদ্ধে জেতা যায় না, পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম বহু দৃষ্টান্ত আছে। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দীন মুহম্মদ বাবর মোগল ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হয়ে অবস্থান করছেন। পানিপথের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়— তিনটি যুদ্ধই সেই গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। এ ছাড়াও ভারতে অনেক দৃষ্টান্ত আছে। যা রীতিমতো গবেষণার বিষয় হয়ে আছে।

দারাশিকোহ বিশাল বাহিনী নিয়ে সামুগড়ে অবস্থান করছিলেন। তাঁর সৈন্য সংখ্যা ছিল কমপক্ষে ৫০,০০০। এ ছিল এক সুসমৃদ্ধ বাহিনী। তারা ছিল শাহি সামগ্রীতে পূর্ণ একটি বাহিনী। কিন্তু এত সংখ্যক হলেও কী হবে? এই সংখ্যার জোরে যে যুদ্ধজয় সম্ভব ছিল না পরবর্তী ঘটনাক্রম থেকে তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

দারার বাহিনীতে ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক ছিল। যাদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে, তা ছিল এক খিচুরি বাহিনী। তাদের না ছিল সুসংহত সেনা প্রশিক্ষণ, না ছিল শক্তিশালী ও সুযোগ্য সেনানায়ক। মানসিকভাবে তারা ছিল দুর্বল প্রকৃতির, কেননা, তাদের মধ্যে জয়-পরাজয় নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং ধন্দ দুই-ই ছিল। এমনকি, ভাবী সম্রাটের বিষয়েও তাদের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল। বিপক্ষে যে আওরঙ্গজেব, সেই আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে তাদের মধ্যে ভীতি বিরাজ করছিল। কেননা, তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত যুদ্ধগুলো তখনও পর্যন্ত অপরাজেয়। তিনি ছিলেন অপরাজেয় বাহিনীর অপরাজিত সেনানায়ক। তাঁর সামনে তাঁর বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে দাঁড়িয়ে, যুদ্ধে জেতা সম্বন্ধে ভয়-ভীতি ও পরাজয়ের মনোভাব জমে উঠেছিল। ফলে, তারা হারার আগে হারার মতো অবস্থার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। তাছাড়া তাদের সেনাপতিরাও যুদ্ধবাগীশ নন, ছিলেন

www.pathagar.com

বাক্যবাগীষ। শুধু তাই নয়, বিশ্বাসঘাতক শব্দটিও তাদের মধ্যে প্রযোজ্য ছিল। কারণ, তাঁদের মধ্যে দারার সম্রাট হাওয়ার যোগ্যতা বিষয়ে সন্দেহ অবিশ্বাস বিরাজ করত। অতএব, তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান ছিলেন। তাছাড়া আওরঙ্গজেব-ভীতি তাদের মন-মস্তিষ্ককে গ্রাস করে নিয়েছিল।

এদিকে দারার মুসলিম সৈন্যরা কট্টর ধর্মাত্মা আওরঙ্গজেবের প্রতি দুর্বল ছিল। তাঁরা দারার চেয়ে আওরঙ্গজেবকে যোগ্য এবং নিরাপদ মনে করত। ফলে, দারার পক্ষে যুদ্ধ করে জীবন ক্ষয় করে কী লাভ হবে— এই মনোভাব বিরাজ করত। তাঁর বহুসংখ্যক মুসলিম সরদারের মনোভাবও এরকম ছিল। ফলে, দারার যুদ্ধজয় নিয়ে তাঁরা প্রথম থেকেই সংশয়ী ছিলেন। এর বাইরে দারার বাহিনীর আরো অনেক ভুলভ্রান্তি ও দোষত্রুটি ছিল। অপ্রশিক্ষিত, নাদান, নিয়মানুবর্তিতার অভাব, সেনাপতি ও নেতার প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের অভাব— এ সব আওরঙ্গজেবের জন্য বড়ই সৌভাগ্যের সহায় ছিল। অপর দিকে, বুলন্দ ব্যক্তিত্ব, উচ্চ হতেও উচ্চতর নেতৃত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং অপরাজেয় সেনাপতি আওরঙ্গজেব ছিলেন বড়ই সৌভাগ্যবান যেখানে তাঁর সেনা ছিল সুপ্রশিক্ষিত ও ঐক্যবদ্ধ সেখানে আদেশ পালনেরও বিশেষ গুণ তাদের ছিল। তাঁর সৈন্যরা ছিল বিশেষ তালিমপ্রাপ্ত। তাদের এমনভাবে সুগঠিত করা হয়েছিল এবং মানসিক শক্তিতে তাদের এই মর্মে পূর্ণ করে দেওয়া হয়েছিল যে, তারা একটা পবিত্র যুদ্ধে নামছেন, যে যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে মুরতাদ-কাফির-ধর্মহীন দারার বিরুদ্ধে।

সামুগড় প্রান্তরে উভয় বাহিনী মুখোমুখি হলো। শুরু হলো ভয়ংকর যুদ্ধ। দারার সৈন্যসংখ্যা আওরঙ্গজেবের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও কুশল সেনানায়ক আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর সামনে দারার বাহিনী অসহায় হয়ে পড়ল। একদিকে কুশল সেনানায়ক আওরঙ্গজেব, অপরদিকে কুশল আয়েশি দারাশিকোহ। তিনি হতাশ হয়ে দেখলেন তাঁর বিশাল বাহিনী আওরঙ্গজেবের কুশল নেতৃত্বাধীন সুশিক্ষিত বাহিনীর সামনে কীভাবে অসহায়ভাবে মার খাচ্ছে। আওরঙ্গজেবের তাজা দম সৈন্যরা প্রকৃতপক্ষে জিহাদি যুদ্ধ করছিল। জীবন-মরণ-পণ করে যুদ্ধ করছিল। ওদিকে দারার বাহিনী তত প্রশিক্ষিত ও সুগঠিত ছিল না। তা ছাড়া তারা মানসিকভাবে দুর্বল ছিল। ধর্মাত্মা আওরঙ্গজেবের প্রতি তাদের ভয়, শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সবটাই ছিল। প্রকৃতপক্ষে, তারা তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত ছিল। দারা আদৌ ভারত-সম্রাট হতে পারবেন কি-না তা নিয়েও তাদের মনে সংশয় ছিল। সব

www.pathagar.com

মিলিয়ে যা ঘটতে চলল, তা হলো দারার পরাজয়। কুশল সেনানায়ক না হওয়াতে যুদ্ধক্ষেত্রে বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিতে তিনি অপারগ ছিলেন। ফলে, অন্যের পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক তিনি রণনীতি ঠিক করতেন। এর পরিণামে তিনি আরো একবার ভুল করে ফেললেন। যুদ্ধের গতিবিধি বিগড়ে যেতে দেখে সেনাপতির পরামর্শ চাইলেন। সেনাপতির কথায় তিনি হাতি ছেড়ে ঘোড়ায় চড়লেন। এ ছিল এক চরম হঠকারিতা। এর পরিণাম হলো অতি ভয়াবহ। তাঁর ভাগ্য বিপর্যয়ের সূচনা হয়ে গেল। আওরঙ্গজেব বাজি জিতলেন। দারা পালিয়ে গেলেন। যুদ্ধে দারার কয়েকজন প্রধান সরদার ও সেনাপতি নিহত হলেন।

আগ্রা কেল্লায় শাহজাহানের কাছে এ খবর অতি দ্রুত পৌঁছে গেল। তাঁর কন্যা জাহানআরা এবং অন্য মহিলাগণ এ কথা জানতে পেরে শোকাতুর হয়ে বিলাপ করতে লাগলেন। বৃদ্ধ শাহজাহানের দুঃখের অন্ত রইল না। তাঁর বিজিত সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে তাঁর পুত্রদের মধ্যেকার এ রক্তাক্ত যুদ্ধ তাঁকে ব্যথিত-মথিত করে তুলল। তিনি শোকাকুল হয়ে উঠলেন। শাহজাহান তাঁর অন্তর্চক্ষু দিয়ে দেখলেন তাঁর জীবনের সেই সংগ্রামী দিনগুলোকে। তিনি নিজেও তাঁর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিলেন। অবশ্য ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ তাঁকে করতে হয়নি। তাঁর বিমাতা ভাইয়েরা কেউই যোগ্যতায় তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। সিংহাসন পায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রাকৃতিকভাবে তাঁর রাস্তা থেকে সরে গিয়েছিল।

এবার তিনি দেখলেন ভিন্ন দৃশ্য। তাঁর সহোদর সন্তানদের মধ্যে উত্তরাধিকার যুদ্ধ দেখলেন। এর শেষ কোথায়? তা ভেবে ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি শোকের সাগরে ডুবে গেলেন। তখন অভাগা দারা পিতার পায়ে এসে পড়লেন এবং কাঁদতে-কাঁদতে তাঁর 'অভাগা পুত্র'র জন্য দোয়া প্রার্থনা করলেন। শাহজাহান তাঁকে বিপদে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিয়ে, পুনরায় লড়তে বললেন। তাঁর পিতার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎ করে দারা দিল্লি অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। বলাবাহুল্য, যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির পিঠ থেকে নেমে তিনি যখন ঘোড়ার পিঠে চড়েছিলেন তখন তাঁর ভাগ্যও তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেল। এবার তিনি দিল্লি চললেন, মানে এক মহা দুর্ভাগ্যের পথে পা বাড়ালেন।

এ এমন সময় বিজয়ী আওরঙ্গজেব মুরাদকে সঙ্গে নিয়ে সসৈন্যে আগ্রা এসে পৌঁছালেন। সাথে সাথে শাহজাহান কেল্লার দরজা বন্ধ করে দিয়ে

www.pathagar.com

মোকাবিলা করার প্রয়াস করলেন। কুশলী আওরঙ্গজেব এই পরিস্থিতি* মোকাবিলার জন্য নানা পন্থা অবলম্বনের চিন্তা করলেন। অবশেষে, আওরঙ্গজেব কেল্লার পানি বন্ধ করে দিলেন এবং পিতার সামনে গিয়ে হাজির হলেন। পিতা তাঁকে যাচ্ছেতাই করলেন। অনেক হুমকি-ধমকিও দিলেন। কিন্তু বাল্যকালে হাতির সঙ্গে লড়াই করা যুবক পুত্র আওরঙ্গজেব এসব ধমকিতে দমবার পাত্র ছিলেন না। শাহজাহান তাঁকে অনেক বোঝালেন এবং আওরঙ্গজেব তাঁকে এই উত্তরই দিলেন যে, দারা ইসলাম-বিরোধী, এ জন্য তাঁর দণ্ডই পাওয়া উচিত। তিনি পিতা শাহজাহানকে দারার পক্ষ ত্যাগের আখ্যান জানালেন। বৃদ্ধ পিতা উপরে-উপরে দেখাতে চাইলেন যে, তিনি আওরঙ্গজেবকেই চান কিন্তু গুপ্তরূপে তিনি দারার পক্ষাবলম্বী ছিলেন এবং গোপনে দারার সঙ্গে পত্র মারফত যোগাযোগ রেখে চললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দারার পক্ষ এবং সৌভাগ্য আওরঙ্গজের পক্ষ নিল। ইতিমধ্যেই কয়েকটি পত্র আওরঙ্গজেবের হাতে এসে পড়ল। যার ফলে, বাধ্য হয়ে তিনি পিতাকে 'নজরবন্দি' করতে বাধ্য হলেন।

---

*এ যুদ্ধে মরলে শহিদ, জিতলে গাজি। প্রেরণাটা ছিল জিহাদের। যে যুদ্ধ তাঁর পূর্ব পুরুষ বাবর রাণা সাঙ্গার বিরুদ্ধে করেছিলেন এবং জয়লাভ করেছিলেন। তার পর সামুগড়ের যুদ্ধে আওরঙ্গজেব জিতলেন; অমুসলিম শত্রুদের প্রিয়পাত্র দারার বিরুদ্ধে।

ঘটনাক্রম এ রকম

দারার বাহিনী আওরঙ্গজেবের এ রকম তাজা দম সেনার বিরুদ্ধে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হলো ধমাসান যুদ্ধ। স্বয়ং দারা শাহি হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধের নেতৃত্ব দিতে লাগলেন। আওরঙ্গজেবের বাহিনীর সঙ্গে জেতার সকল প্রয়াস তিনি চালিয়ে গেলেন। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, তিনি বহু যুদ্ধে নেতৃত্ব দানকারী, অপরাজেয় সেনাপতি আওরঙ্গজেব ও তাঁর প্রশিক্ষিত বাহিনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলেন। তাঁর বাহিনী ছিল সেই বাহিনী, এই যুদ্ধে যারা জীবন-মরণপণ করে নেমেছিল। তাঁর বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক তাঁকে তাঁদের প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসত। সে জন্যই তো তাদের প্রিয় নেতা ও ভবিষ্যতের ভারত-সম্রাটের পক্ষে লড়াই করছিল। তাদের জোশ ছিল 'মরলে শহিদ, বাঁচলে গাজি' এবং তাদের নেতা ছিলেন অপরাজের সৈনিক ও সেনাপতি আওরঙ্গজেব। আওরঙ্গজেবের বাহাদুরি ও রণকৌশলের সামনে দারা টিকতেই পারলেন না। ধমাসীন যুদ্ধের মধ্যে দারার বাহিনীর মধ্যে ভগদড় মচে গেল। বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ল। দারা নিজেও বিভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর এক পরামর্শকের কথায় তিনি একটি মস্ত বড় ভুল করে বসলেন। তিনি শাহি হাতির পিঠ থেকে নেমে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। বিভ্রান্তি চরমে পৌছে গেল। তাঁর বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল 'দারা হত ইতি'* পরিণামে, তাঁর সৈন্যরা রণক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দারার 'জয়ের মুঠি' আলগা হয়ে গেল। সৈন্যরা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যেতে লাগল। দেখতে দেখতে ময়দান সাফ হয়ে গেল। বিজয় আওরঙ্গজেবের পদচুম্বন করল। যুদ্ধে দারার অনেক বাহাদুর সরদার নিহত হলেন।

www.pathagar.com

আরওঙ্গজেব পিতাকে 'নজরবন্দী' করলেন, তার মানে এই নয় যে, তিনি তাঁর পিতাকে হীন চোখে দেখতেন। পিতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তিনি এটি এ জন্য করলেন যে, তাঁর পিতার পরে এই দেশ ও জাতি— বিশেষ করে দেশের মুসলমানদের ভবিষ্যৎ কী হবে। কারণ, এ যুগের ন্যায় সে যুগেও উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভারত থেকে মুসলমানদের নির্মূল করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকত। ওই যুগে, এ যুগের চেয়েও মুসলিম সংখ্যা কম ছিল। মুসলমানদের শক্তি যা ছিল— তা ছিল তাদের রাজনৈতিক শক্তি। এই রাজনীতি এবং রাজশক্তি তাদের হাতছাড়া হয়ে গেলে, মুসলমানদের অসহায়ভাবে মার খেয়ে দেশ থেকে নির্মূল হয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকত না। আওরঙ্গজেবের মতো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তির এ সত্য অনুধাবনের যোগ্যতা ছিল সবচেয়ে বেশি। এ যোগ্যতা দারা ও তার অন্য ভাইদের ছিল না। ওই যুগেই আওরঙ্গজেব এ কথা খুব ভালোমতোই জানতেন এবং বুঝতেন যে, হিন্দুরা কোনো মুসলমানকে তখনই পিঠ চাপড়ায় যখন সেই মুসলমান তাদের খুশি করার জন্য স্বধর্মীয় ও স্বজাতীয়দের সর্বনাশ করে। আর হিন্দুরা সেই মুসলিমকে গালি দেয় এবং নিন্দা করে যখন সে তার স্বজাতীয় ও স্বধর্মীয়দের কল্যাণার্থে কোনো কাজ করে। সুতরাং হিন্দুরা তাঁকে কী বলল– নিন্দা করল না প্রশংসা করল, তা নিয়ে তাঁর কোনো পরোয়া ছিল না। তিনি চিন্তিত ছিলেন এ দেশে ইসলাম ও মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে।

দারাকে সিংহাসনে বসতে দিতে এবং দেশের পরবর্তী মোগল সম্রাট হতে দিতে তিনি কোনো অবস্থাতেই প্রস্তুত ছিলেন না। শুধু এই কারণেই যে, দারা আকবরের মতো ধর্মনীতি অবলম্বন করলে এবং আকবরের পথ অনুসরণ করলে মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হতে বাধ্য।

সর্বকনিষ্ঠ ভাই মুরাদের রাজনৈতিক জ্ঞান-প্রজ্ঞার কথা ধর্তব্যের মধ্যেই আসে না। হাতির সঙ্গে লড়াই করা তো দূরের কথা— বড় কোনো যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ায় যোগ্যতাও তাঁর ছিল না। এদিকে আরওঙ্গজেব বড় বড় যুদ্ধ জিতে আগ্রা কেল্লায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পরবর্তী মোগল সম্রাট হওয়ার জন্য সিংহাসন তাঁর পদ চুম্বনের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষায় ছিল।

দারা এবং সুজা— উত্তরাধিকার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। রয়ে গিয়েছিলেন মুরাদ ও আওরঙ্গজেব। মুরাদ তখনও দিল্লির বাদশাহ হওয়ার স্বপ্নে বিভোর। মুরাদের সেনাপতি ও সরদারগণ নির্বোধ মুরাদের চোখ খুলে দিতে গিয়ে পরামর্শ দেন যে, আওরঙ্গজেবকে বিশ্বাস করার পরিণাম তাঁর

www.pathagar.com

জন্য মোটেও মঙ্গলদায়ক হবে না। তখন মুরাদ বুঝলেন যে, তাঁর 'ফকির ভাই' তাঁকে সিংহাসনের ফাঁকা প্রলোভনে তাঁকে ভুলিয়ে রেখেছেন। এই সময়ে শাহি সেনার শিবির মথুরায় অবস্থান করছিল। ওই সময়ে আওরঙ্গজেব চিন্তা করছিলেন তাঁকে কীভাবে ঠাণ্ডা করা যায়। কারণ, তিনি মুরাদকে ভারত শাসনের অযোগ্য বলে মনে করতেন। একদিন রাতে মুরাদ যখন শিকার করে নিজের তাঁবুতে ফিরছিলেন তখন আওরঙ্গজেব তাঁকে তাঁর শিবিরে পানাহারের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। সেই সঙ্গে তিনি তাঁকে 'তাজপোশী'– রাজ্যাভিষেক করার কথাও জানিয়ে দিলেন। সহজ-সরল-ভোলা-ভালা মুরাদ বাদশাহির স্বপ্নে বিভোর এমনিতেই ছিলেন। ফলে তিনি সেই ফাঁদে পা দিলেন এবং ভাইয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে পানাহারে বসে গেলেন।

আওরঙ্গজেব মিষ্টি-মধুর বাক্য বিনিময় শুরু করলেন। এমনকি, যিনি কখনও মদ পান তো দূরের কথা, ছুঁয়েও পর্যন্ত দেখেননি, সেই আওরঙ্গজেব বড় ভাই হয়ে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে শরাব পানের আগ্রহ প্রকাশ করলেন। মুরাদ শরাব পানে অতিরিক্ত রকমের অভ্যস্ত ছিলেন। তিনি এ প্রস্তাব কীভাবে প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন? অগত্যা পেয়ালার পর পেয়ালা চড়তে লাগল। এতক্ষণ তো মদ মুরাদ খাচ্ছিলেন এবং মদ মুরাদকে গ্রাস করে ফেলল। তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন এবং বিছানায় পড়ে রইলেন। এবার তাঁর অস্ত্র সরিয়ে নেওয়া হলো এবং লোহার বেড়ি পরিয়ে তাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে রওনা করিয়ে দেওয়া হলো। মুরাদের আচরণ সম্পর্কিত অনেক বিবরণ পাওয়া যায় কিন্তু তাতে যে সত্যই থাকুক না কেন, এ কথা বলতেই হবে যে, দেশের শান্তির জন্য আওরঙ্গজেবের কাছে এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। এই ছল কপটতার উদ্দেশ্য একটাই ছিল যে, বিনা রক্তপাতে শান্তির সঙ্গে কাজ সম্পন্ন করা এবং তাঁর এ উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।

www.pathagar.com

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের প্রথম রাজ্যাভিষেক ও দারার পতন

আয়েজজাবাদের বাগিচায়, ২১ জুলাই, মোতাবেক ১ জিলকদ, ১০৬৮ হিজরি পবিত্র জুমা বার, অর্থাৎ শুক্রবারে, আওরঙ্গজেবের রাজ্যাভিষেক হলো। 'ধীরে চলো' নীতি অবলম্বন করে তিনি তৎক্ষণাৎ জুমার নামাজে, নিজের নামে খুৎবা পড়ালেন না এবং সেই সঙ্গে নতুন মুদ্রাও চালু করলেন না। এ কাজগুলো তিনি আগামীর জন্য রেখে দিলেন।

এদিকে দারাও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি শেষ প্রয়াসও চালালেন। কিন্তু সেখানেও পরাজিত হলেন। এবার তাঁর নিজের জীবন রক্ষার জন্য পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। তিনি লাহোর থেকে মুলতানে পালিয়ে গেলেন। রাজপুত্র দারা, যিনি সারা জীবনেও যে দুঃখকষ্টের কথা শুনেছিলেন কিন্তু সওয়ার কথা ভাবতে পারেননি আজ তিনি সেই ভয়াবহ দুঃখকষ্টের কবলে পড়ে গেলেন। শীতের শীতলতা ও গ্রীষ্মের দাবদাহের সঙ্গে তাঁর সামান্যতম পরিচয়ও ছিল না, তিনি আজ সেই দুঃখকষ্ট দীন-হীন মানুষের মতো সয়ে যেতে লাগলেন। দিনকে দিন, রাতকে রাত তাঁর এভাবে কাটতে লাগল। সম্রাট শাহজাহানের পরেই যে দারা আজীবন সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখে এসেছেন তিনি আজ সর্বস্বান্ত হয়ে তাঁর অধীনস্থদের কাছে আশ্রয়ের সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। কোথায় আশ্রয়? পাঞ্জাবে আশ্রয় মিলল না, মিলল না সিন্ধুতেও, এমনকি গুজরাটে, এমনকি আহমাদাবাদ পর্যন্ত এলেন এবং অবশেষে বছের রাওয়ের অতিথি হলেন। ওই সময়ে, ১৬৫৯ ঈসায়ীতে রাজপুত রাজগণ তাঁকে আহ্বান করে আজমীঢ়ে ডেকে নিলেন এবং সিংহাসন লাভের জন্য তাঁকে উৎসাহিত করলেন। এই প্রচেষ্টায়ও হতভাগ্য রাজপুতেরা পরাজিত হলো। এবার হিন্দুস্তানের আর কোনো এলাকায় দাঁড়াবার জায়গা তাঁর আর রইল না। এবার তিনি ইরানে পালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন।

www.pathagar.com

ইতিহাস এখানে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। অতীতমুখী করে দেয়। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর সামরিক সাহায্য লাভের মানসে ইরান গিয়েছিলেন। তারই পথ ধরে দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ূনও একই উদ্দেশ্যে ইরান গিয়েছিলেন। বহুকাল যাবৎ ইরানের শাহ রাজবংশের সঙ্গে মোগল বাদশাহের সুসম্পর্ক ছিল। অবশেষে কান্দাহার নিয়ে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত জাহাঙ্গীরের আমলে। তারপর শাহজাহানের আমলেও কান্দাহার নিয়ে দ্বন্দ্ব চলে এবং কান্দাহার চিরকালের জন্য মোগলদের হাতছাড়া হয়ে যায়। কান্দাহার ইরানের শাহ রাজবংশের অধিকারে চলে যায়। এবার পরাজিত দারা সেই ইরানে আশ্রয় নিতে চলেছিলেন। কিন্তু সে পর্যন্ত তিনি পৌঁছাতে পারলেন না। বোলান গিরিপথের শেষ প্রান্তে দাদর নামক কেল্লায় তিনি আশ্রয় পেতে চাইলেন। কিন্তু তা আর তাঁর কপালে জুটল না। সেখানকার কেল্লারক্ষক তাঁকে ধোঁকায় ফেলে আটক করলেন এবং সেখান থেকে তাঁকে আওঙ্গজেবের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হতভাগ্য দারার কপালে কী ছিল? অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কষ্টদায়ক উপলব্ধি। সারা জীবন ধরে সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন লালন করে আসা দারার এ দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার প্রত্যক্ষদর্শীরাই মাত্র সে বর্ণনা দিতে পারতেন।

গ্রেফতার করে আনা দারাকে তো প্রথমে কয়েদখানায় বন্দী করা হলো। তারপর, তাঁকে অপমান-অপদস্থ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের জন্য দিল্লির অলিগলিতে ঘোরানো হলো। প্রথমে তো একটি দুর্গন্ধযুক্ত হাতির পিঠে উল্টো করে বসানো হলো। তারপর, তাঁকে ঘোরানো হলো। এবার হাতির পিঠ থেকে নামিয়ে একটি গাধার পিঠকে কাদাপানি দিয়ে পিছল করে দিয়ে তার পিঠে উল্টো করে বসানো হলো। অপমান-অপদস্থতার সীমা অতিক্রম করে গেল। এই দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার কবল থেকে একমাত্র মৃত্যুই তাঁকে মুক্তি দিতে পারত।

আওরঙ্গজেব এ কথা খুব ভালোমতোই জানতেন যে, একজন রাজা বা বাদশাহর সবচেয়ে বড় শত্রু হতে পারে তার নিকটাত্মীয়ই। দারা বেঁচে থাকলে তিনি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবেন। সেই শত্রুতার কবল থেকে আত্মরক্ষা করে ক্ষমতায় টিকে থাকা তাঁর পক্ষে সুকঠিন হয়ে পড়বে। অতএব, দারা এবং তাঁর পুত্রকে ধোঁকায় ফেলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করলেন। এ সম্পর্কে ইতিহাসে ভিন্ন বিবরণও পাওয়া যায়। তাঁকে 'ইরতিদাদ' অর্থাৎ ইসলাম তথা ধর্মদ্রোহিতার দায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ইসলাম ধর্মে ইরতিদাদের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী বলে অভিযুক্ত হন। আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল যে, দারা মুরতাদ। সুতরাং মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। বাস্তবে তাই

www.pathagar.com

হলো। তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের পর আওরঙ্গজেব নিশ্চিত হয়ে গেলেন। তবে, রাজকীয় রসমের আরো কিছু বাকি ছিল। সে যুগে বিদ্রোহী ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জনসমক্ষে ঘোরানোর রীতি ছিল। যাতে জনতা তা থেকে সাবধান থাকে। সেই মতো, দারা ও তাঁর মৃত পুত্রকে দিল্লির অলিগলিতে ঘোরানো হলো। রাজপুত্র হয়ে পৃথিবীতে জন্ম নেওয়া ও বেদনাদায়ক পরিণতি বরণ করা— কী দুঃখদায়ক ব্যাপার!

রাজপরিবারে জন্মে নেওয়া এবং পরমাদর ও স্নেহে বেড়ে ওঠা– এ তো বড় সুখশান্তির ব্যাপার। কিন্তু রাজ্যলোভ? এ বড় সর্বনেশে ব্যাপার। উপরে ঠাটবাট আর ভিতরে ফাঁকা। রাজ্য-রাজনীতির মতো জটিল এবং কুটিল বিষয়– সে কি সবার যোগ্য? এক রাজার চার পুত্র সবাই কি রাজা হয়? সিংহাসনের দাবিদার তো সবাই হয়। সিংহাসনে কি সবাই বসতে পারে? রাজ্যপাট চালানোর যোগ্যতা কি সবার থাকে? বীরভোগ্যা বসুন্ধরা— বাক্যটি কি সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? জ্বলন্ত প্রশ্ন হলো— শাহজাহানের চার পুত্রের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য এবং বীর কে ছিলেন? একজন শিশুতেও বলবে আওরঙ্গজেব। তা সত্ত্বেও কেন এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতি?

ইতিহাসের প্রতি নজর দৌড়ানো যাক। ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের চার পুত্র ছিলেন। তিনি তাঁর সদ্য প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করার আগেই পরপারের ডাকে সাড়া দিয়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। তবে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁর চার পুত্র সাম্রাজ্যের চারটি অংশ লাভ করেন। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। পারস্পরিক হানাহানির এক পর্যায়ে বাবরের তিন পুত্রের পতন ঘটে। টিকে থাকেন হুমায়ূন। টিকিয়ে রাখেন সাম্রাজ্য। দ্বিতীয় মোগল সম্রাট হুমায়ূনের পুত্র আকবর সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। হুমায়ূনের অন্য পুত্র মির্জা হাকিম কাবুলের শাসনভার লাভ করলেও তিনি দিল্লির দিকে পুনপুন দৃষ্টি দিতে থাকেন। অবশেষে ব্যর্থ হন মির্জা হাকিম। আকবর তাঁকে ক্ষমা করেন। হাকিম অধ্যায় ওখানেই শেষ হয়ে যায়। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে তার আর উল্লেখ পাওয়া যায় না।

আকবরের তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্রই তাঁর জীবৎকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। ভারত ইতিহাসে তাঁদের বংশধারার কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। সেলিম একাই বেঁচে ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দেন। এ ছিল এক অদ্ভুত উদ্দীপ্ততার পরিচয়।

www.pathagar.com

এরও একটা গুরুতর কারণ ছিল। সেলিমের উদ্দীপ্ততার কারণেই চতুর্থ মোগল সম্রাট রূপে সেলিমের পুত্র, আকবরের পৌত্র খসরুর নাম বারবার ওঠে আসছিল। দরবারে তাঁর পক্ষ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। হিসেব মতো আকবর তাদের দ্বারা প্রায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আকবর পড়েছিলেন মহা ফাঁপরে। সাংঘাতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই তাঁর দিনাতিপাত হচ্ছিল। এদিকে পুত্র সেলিমকে তিনি উপেক্ষা করতে পারছিলেন না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির মধ্যেই সেলিম বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আকবর বিদ্রোহী পুত্রকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং মৃত্যুর পূর্বে সেলিমকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তখন খসরুর পক্ষের লোকেরা আকবরকে ব্যতিব্যস্ত করেছিল।

সেলিমপুত্র খসরু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তার পরিণাম হয়েছিল অতি ভয়াবহ। পিতা আকবর বিদ্রোহী পুত্র সেলিমকে ক্ষমা করলেও, সেলিম জাহাঙ্গীর হয়ে রাজ্যপাট পাওয়ার পর, তাঁর বিদ্রোহী পুত্র খসরুকে ক্ষমা করেননি, তাঁর প্রতি তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করেছিলেন। তিনি তাঁকে অন্ধ করে দিয়েছিলেন। পরে তাঁকে আরও দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক পরিণাম ভুগতে হয়েছিল।

জাহাঙ্গীর তাঁর আত্মকথায়, খুররমকে 'সৌভাগ্যবান পুত্র' বলে অভিহিত করেন। তিনিই তাঁকে শাহজাহান উপাধি দেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে দিশেহারা শাহজাহান পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা বুলন্দ করেন। ওই সময়ে জাহাঙ্গীর নানা যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে শাহজাহানকে 'বেদৌলত' বলে অভিহিত করেন। যার অর্থ 'ভাগ্যহীন'। 'বিদ্রোহী রণক্লান্ত' শাহজাহান পিতার কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু ক্ষমা পাননি। অবশেষে, নিজ পুত্র ও বিশিষ্ট সেনাপতির বিদ্রোহের মুখে পড়ে জাহাঙ্গীর আরো বিধ্বস্ত হন এবং পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ মরুপথ অতিক্রম করে, ক্ষমতার পথের সমস্ত বাধা অতিক্রম করে শাহজাহান সম্রাট হন। সেই শাহজাহান এবার বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মুখোমুখি। এখন সাম্রাজ্য টলমল।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক মোগল সাম্রাজ্যের এই অঘটন দুর্ঘটনকে উত্তরাধিকার মনোনয়নের বিশৃঙ্খলতাকে দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, জ্যেষ্ঠপুত্রকে উত্তরাধিকার মনোনয়নের সুনির্দিষ্ট নীতি থাকলে এ অঘটনগুলো ঘটত না। একে 'জ্যেষ্ঠপুত্র তত্ত্ব' বলে অভিহিত করা যেতে পারে। বলাবাহুল্য, এ তত্ত্ব ভ্রান্ত। কেননা, জ্যেষ্ঠ পুত্র সব সময় যোগ্য না-ও হতে পারে। ফলে

www.pathagar.com

সাম্রাজ্য অযোগ্যের হাতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। পরিণামে, সুযোগ সন্ধানীরা সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যকে টুকরো-টুকরো করে ফেলতে পারত। এমতাবস্থাও এ তত্ত্ব অগ্রহণযোগ্য ছাড়া আর কিছু হতে পারত না।

তা ছাড়া ইসলামে অন্ধ আনুগত্যের কোনো স্থান নেই। সে যোগ্যতা এবং যোগ্য ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। এটা প্রকৃতিরও বিধান। প্রকৃতিতেও সৃষ্টির সকল ক্ষেত্রে, সকল জীবের মধ্যেই যোগ্যতমের টিকে থাকার তত্ত্ব বিদ্যমান রয়েছে। মোগল সাম্রাজ্যেও এ তত্ত্বই যে কার্যকর থাকবে— তাতে আর আশ্চর্যের কী আছে?

সাম্রাজ্যের গুরুদায়িত্ব গ্রহণের পথে, আওরঙ্গজেবের সামনে তখনও আর একটা বাধা বিদ্যমান ছিল। তা ছিল তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুরাদের প্রসঙ্গ। সম্রাট শাহজাহানের অসুস্থতার সময় তিনি গুজরাটের সুবেদার ছিলেন। ওই ডামাডোলের মধ্যে তিনি সম্রাটের বিশেষ প্রতিনিধিকে হত্যা করেন। সেই হত্যাকাণ্ডের দায়ে তিনি অভিযুক্ত ছিলেন। এবার সেই মামলা সামনে এলো। যাকে হত্যা করা হয়েছিল, তাঁর পুত্র যথারীতি তাঁর পিতার হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইলেন। গোয়ালিয়রের কাজির কাছে ন্যায়বিচারের জন্য শাহি ফরমান গেল। কাজির আদালতে সাক্ষ্য-প্রমাণের নিরিখে মুরাদ অপরাধী সাব্যস্ত হলেন এবং যথারীতি তাঁর ফাঁসিতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা হলো। এভাবে মুরাদও সাফ হয়ে গেলেন। আওরঙ্গজেবের নিরঙ্কুশ বাদশাহি লাভের পথে আর কোনো বাধা রইল না।

আওরঙ্গজেব ১৬৫৯ ঈসায়ী সালের মে মাসে 'বাদশাহ' উপাধি ধারণ করলেন এবং ২৬ তারিখে তিনি মুকুট ধারণ করলেন। মুহিউদ্দীন মুহম্মদ আলমগীর বাদশাহ গাজি নাম ধারণ করে তিনি ভারতবর্ষের সর্বাধিনায়ক বাদশাহ হয়ে গেলেন।

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, সিংহাসনরূপী সিংহের পিঠে আসীন হতে আওরঙ্গজেবকে কোন কোন কষ্ট-বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল এবং কোন কোন ভয়ংকর এবং কঠিন কাজ তাঁকে আনজাম দিতে হয়েছিল। নিজের ভাইদের হত্যা এবং পিতাকে বন্দী করেই তিনি ক্ষমতাসীন হয়েছিলেন— এ সকল কাজের জন্য তাঁকে বড় কঠোর নিন্দা করা হয়েছে। তবে ইতিহাসে কি এর চেয়ে কঠোর-কঠিন নিন্দনীয় আচরণের দৃষ্টান্ত আর নেই? দি গ্রেট অশোক কি তাঁর শত ভাইকে হত্যা করে নিজের হাত রক্তরঞ্জিত করে সিংহাসনে বসেননি? তুর্কিস্তানের সুলতান মুহম্মদ শরীফ তাঁর ভাইদের অন্ধ করে

www.pathagar.com

দিয়েছিলেন। খোদ ইতিহাসেই যেখানে এতসব বেদনাদায়ক অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়ে গেছে সেখানে একা আওরঙ্গজেবকে অধিক দোষ দিয়ে লাভ কী? মোগল সাম্রাজ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসন লাভের কোনো নিয়ম ছিল না। এ তত্ত্ব তো পূর্বেই খণ্ডন করা হয়েছে।

সিংহাসন লাভের জন্য কি হুমায়ূনকে তাঁর ভাইদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়নি? বাবর তো হুমায়ূনকে উত্তরাধিকার মনোনীত করে গিয়েছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে সিংহাসনে শান্তিতে থাকতে দেননি। শেষ পর্যন্ত যা হলো ইতিহাস তার সাক্ষী। কামরান, আসকারি, হিন্দাল একে একে সবার পতন হয়ে গেল। অবশ্য হিন্দাল হুমায়ূনকে তত কষ্ট দেননি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে হিন্দাল এক নৈশ যুদ্ধে বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। যার জন্য দায়ী ছিলেন কামরান। ভ্রাতৃঘাতী কলঙ্কের দাগ কামরানের ওপর পড়ে যায়। সারকথা হলো, দ্বিতীয় পর্যায়ে দিল্লি অধিকারের সময় হুমায়ূনের ভাইয়েরা আর কেউ জীবিত ছিলেন না।

তৃতীয় মোগল সম্রাট আকবরকে তাঁর ভাই মির্জা হাকিমের সাথে মোকাবিলা করতে হয়। হাকিম পরাজিত হন। আকবর তাঁকে ক্ষমা করে দেন। পিতার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরের বিদ্রোহের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। পিতা জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাহানের বিদ্রোহের কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। পরের ধাপে তো আওরঙ্গজেব রয়েছেন। কাকে বাদ দিয়ে কাকে প্রশংসা আর কাকে নিন্দা করা যাবে?

সন্দেহ নেই, এমন কঠোর কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করে আওরঙ্গজেব ক্ষমতায় এসেছিলেন। এটাই ছিল বাস্তব। তিনি ক্ষমতায় এসে পুরো ভারতবর্ষের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে নিয়ে এসে দেশে শান্তি, সুস্থিতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। এ কাজ তিনি ছাড়া আর কেউ করতে পারতেন না। এটাই নির্বিবাদ সত্য।

এখন প্রশ্ন হলো, তিনি এটা না করলে, পরবর্তী মোগল সম্রাট কে হতেন? দারা, সুজা, মুরাদ? ইতিহাসের কোনো দায়িত্বশীল বিচারক এ রায় দিতে পারবেন না যে, আওরঙ্গজেব ছাড়া পরবর্তী মোগল সম্রাট অন্য কেউ হতে পারতেন। যুক্তির খাতিরে দারাশিকোহর কথা ধরা যাক! তাঁর সম্পর্কে ঐতিহাসিকেরা একমত যে, দারা ঢিলেঢালা গোছের, মদিরা পিয়াসী, ইন্দ্রিয় পরায়ণ এবং দুর্বলচিত্তের মানুষ ছিলেন। তিনি জ্ঞানী, পণ্ডিত, উদার, দার্শনিক, ধর্মনিরপেক্ষ ইত্যাদি ছিলেন। সে জন্য তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয়। কিন্তু এসব তো

www.pathagar.com

তার নিজের জায়গায় ঠিক আছে। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে? রাজনৈতিক জটিলতায় কঠোর কঠিন আবর্তের মধ্যে এসব গুণ কোন কাজে আসতে পারত? যে ব্যবহারিক প্রক্রিয়া দেশ ও জাতির কাজে আসতে ব্যর্থ, সে জ্ঞান কার জন্য মঙ্গলদায়ক হতে পারে? দার্শনিক জ্ঞান দার্শনিক আলোচনায় দর্শনের কাজে আসে, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য আলোচনার টেবিলে কিংবা বইপত্র লেখায় কাজে আসতে পারে। উদারতা তার নিজের জায়গায় ঠিক আছে, তেমনই ধর্মনিরপেক্ষতাও। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে যখন মারাঠি বর্গীরা 'হর হর মহাদেব' বলে অহিন্দুদের হাঁ করে খেতে আসে, অহিন্দুদের ঘরে আগুন জ্বালাতে আসে, তাদের মোকাবিলায় আত্মরক্ষার জন্য এ সব জ্ঞান কোন কাজে আসতে পারে? বলাবাহুল্য, এ সকল নানাবিধ কারণে দারাশিকোহ খুব স্বাভাবিকভাবেই মোগল সম্রাট পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। বিষাক্ত সাপের ছোবল প্রতিহত করতে দার্শনিকতা, উদারতা ও ধর্মীনিরপেক্ষতার বিদ্যে কোনো কাজে আসে না। কুকুরের বাঁকা লেজও বিষাক্ত সাপের বাঁকানো সোজা লেজ করতে গেলে যে যোগ্যতা লাগে— সে যোগ্যতা শুধু দারা নন, সুজা, মুরাদ কারোরই ছিল না। সে যোগ্যতা একমাত্র আওরঙ্গজেবের ছিল। তিনি সেই যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন এবং যুগের দাবি ও কালের ভাষা পড়ার এবং তা পালন করার যোগ্যতা তাঁর ছিল বলেই মহাযুগ এবং মহাকালই তাঁকে সিংহাসনে বসিয়েছিল।

তিনি যুগের দাবি পুরো করেছিলেন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেব ও উত্তর ভারত

সিংহাসনারোহণের পর আওরঙ্গজেব অনেককাল যাবৎ শান্তি ভোগ করতে পারলেন। এশিয়া এবং আফ্রিকার– বিশেষত, আবিসিনিয়া, ইরান, আরব প্রভৃতি দূর-দূরান্তের দেশগুলো থেকে রাজদূতেরা আসতেন তাঁকে মুবারকবাদ জানাতে। বাদশাহ আলমগীরের কাছ থেকে বহুমূল্য পোশাক ও উপহারাদি নিয়ে তাঁরা স্বদেশে ফিরে যেতেন। পরিণামে দূর-দূরান্তের দেশগুলোতে বাদশাহর সুনাম-সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এবং ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা আতিথেয়তার কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ইতিপূর্বে মোগল আমলের স্থাপত্যকলার সুনাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আগ্রার তাজমহল, দিল্লির জামে মসজিদ প্রভৃতি স্থাপত্য-কীর্তির কথা দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ যুগের ন্যায় সে যুগেও দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকদের যাতায়াত অব্যাহত ছিল।

এদিকে আওরঙ্গজেবের বিশ্বস্ত সেনাপতি ও সরদারগণ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলো জয় করে রাজ্যের পরিধি বাড়িয়ে চলেছিলেন। এদিকে দাউদ খান ১৬৬১ ঈসায়ীতে বিহারের অমুসলিম শাসককে পরাজিত করে মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন।

আওরঙ্গজেবের অতিশয় বিশ্বস্ত সেনাপতি বাহাদুর বীর উত্তর বঙ্গের পথ ধরে কুচবিহার জিতে নিয়ে আসাম প্রান্তে পৌঁছে গেলেন। ইতিমধ্যে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে রোগব্যাধি ছড়িয়ে পড়ার ফলে তাঁর অনেক সৈন্য মারা গেল এবং তিনি দক্ষিণে পৌঁছানোর পূর্বে ১৬৬৩ ঈসায়ীতে নিজেও মৃত্যুবরণ করলেন।

জামনগরের জমিদার রণমলের পর তাঁর পুত্র ছত্রসাল ক্ষমতাসীন হন এবং তাঁর চাচা রামসিংহ তাকে কয়েদ করে নিজে ক্ষমতা দখল করে নেন। ওই যুগে

www.pathagar.com

জুনাগড়ের ফৌজদারকে কাঠিয়াবাড়ের মালিক বলে গণ্য করা হতো। বন্দীদশা থেকে পালিয়ে ছত্রসাল তার কাছে আশ্রয় নেন এবং তাঁর রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং জামনগরের নামকরণ করেন ইসলামনগর।

কিছুদিন পর বাংলায় সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের কাছ থেকে চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। এদিকে চতুর জয়সিংহ ১৬৬৫ ঈসায়ীতে পুরন্দরের কাছে শিবাজীর সঙ্গে সন্ধি করে মোগল দরবারে যাওয়ার পরামর্শ দেন। শিবাজী সম্বন্ধে পরে লেখা হবে। এখানে এ পর্যন্তই মাত্র উল্লেখ করা গেল।

এ দিকে ব্যথিত-মথিত দুঃখিত শাহজাহান দীর্ঘ বন্দীজীবন অতিবাহিত করার পর ১৬৬৬ ঈসায়ী সালে আগ্রা প্রাসাদে মৃত্যুবরণ করলেন। আওরঙ্গজেব তাঁর পিতার বন্দীদশায়, বড়ই আদর-যত্ন ও মর্যাদার সঙ্গে দিনাতিবাহিত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনো প্রকারের প্রয়োজনীয় বস্তু থেকে তাঁকে বঞ্চিত রাখেননি। প্রকৃতপক্ষে, শাহজাহান এক বাদশাহের মতোই জীবনাতিবাহিত করতেন।

বন্দীদশায়, শাহজাহানের দুঃখকষ্টের দিনগুলোতে তাঁর কন্যা জাহানআরা, যিনি 'বেগম সাহিবা' নামে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনিই তাঁকে মাত্র সান্ত্বনা দিতে থাকতেন। শেষের দিনগুলোতে, পিতাপুত্রের মধ্যে মিলন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত শাহজাহান তাঁর রাজদ্রোহী, স্বজন-নাশক পুত্রের মুখদর্শন করেননি। সমগ্র ভারতবর্ষের মালিক, রাজপ্রাসাদসমূহের আনন্দ ও পরম আনন্দ ও ঐশ্বর্যের সঙ্গে লালিত, যার বসবার জন্য সেবকেরা হাতজোড় করে দণ্ডায়মান থাকত, ক্ষুদ্রতম অবজ্ঞায়ও তাঁবু থেকে মহল অবধি ত্রাহি ত্রাহি রব উঠত, সেই মহারাজাধিরাজ শাহেনশাহ শাহজাহানের মৃত্যুর সময় শুধুমাত্র তাঁর কন্যা জাহানআরাই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কী বিচিত্র এ দুনিয়া! কী বিচিত্র বান্দার কর্মপ্রগতি! পিতার মৃত্যুসংবাদ পাওয়ামাত্রই আওরঙ্গজেব আগ্রা এসে পৌঁছালেন। এবং শব বাহক ও অল্পকিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তি সহকারে, নদীপথে লাশ নিয়ে গিয়ে, তাঁরই নির্মিত মকবরা তাজমহলে দাফন করিয়ে দিলেন।

গাঁজা, গুল, মিথ্যাচার ও প্রতারণামূলকভাবে, তথাকথিত ইতিহাসকাররা আওরঙ্গজেব ও রাজপুতদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন, সত্যের মাপকাঠিতে তা উৎরায় না। আকবর যেখানে রাজপুতদের সঙ্গে মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তুলে নিজের রাজ্যকে মজবুত করে গড়ে তোলেন সেখানে আওরঙ্গজেব তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে মোগল সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গিয়েছিলেন

www.pathagar.com

বলে যে ধারণা প্রচলিত আছে এবং লোকে তা বিশ্বাসও করে। প্রকৃত ঐতিহাসিক সাধন ও বাস্তবিক ঘটনা ও পর্যালোচনায় এটা স্পষ্ট হয় যে, এ কথা প্রমাণসিদ্ধ নয়। ঐতিহাসিক গুণাবলির নিরিখে এ সত্য স্পষ্ট হয় যে, এ হলো প্রতিক্রিয়াশীল, মিথ্যুক ও ভেদবুদ্ধিসম্পন্নদের দ্বারা প্রচারিত অপপ্রচারমাত্র।

রাজপুতদের বিনা কারণে বিগড়ে দিয়ে রাজ্যকে ধ্বংস করেন। এ রকম মূর্খতাচার আওরঙ্গজেবের দ্বারা হতে পারত না। আকবরের মতো তিনিও যেখানে রাজপুতানীদের সঙ্গে স্বয়ং বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন তেমনই নিজের পুত্র-পৌত্রদেরও তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আকবরের অন্তিম দিনগুলোতে রাজপুতেরা তাঁকে বড় কষ্ট দিয়েছিল। তবে, আওরঙ্গজেবের কৃপাধন্য রাজপুত সরদার মিরজা রাণা জয়সিংহ এবং তাঁর বংশধরগণ অন্য রাজপুতদের সাথে শেষ অবধিও প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ত থাকে। আমলমগীর রাজপুতদের সঙ্গে রাজপুতদেরই লড়তে পাঠাতেন। চম্পত বুন্দেলার সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি দেবী সিংহ বুন্দেলাকেই পাঠিয়েছিলেন। এই রকমই দুর্জন সিংহ হাড়াকে হারানোর কাজটি অনিরুদ্ধ সিংহ হাড়াই সম্পন্ন করেছিলেন। উদয়পুর অভিযানে অনেক রাজপুত সরদারও শামিল ছিলেন। সেখানে রাণার ব্যূহ চূর্ণ করার জন্য সুন্দরদাসকেও রাখা হয়েছিল। চিতোর ছেড়ে যখন রাণাকে পালিয়ে যেতে হয় তখন গড়ের 'কেল্লারক্ষক' পদে উদয়সিংহ নামক এক রাজপুত সরদারকেই বসানো হয়।

প্রারম্ভে রাজপুতেরা ভ্রান্ত ধারণাবশত আওরঙ্গজেবের বিরোধী ছিল। এটা স্পষ্ট ছিল যে, আওরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসন মুসলমান সিপাই ও বীর সেনানীদের বাহাদুরি ও হিম্মতের কারণেই লাভ করেছিলেন। যা আগেই বলা হয়েছে যে, দারা-বিরোধী যুদ্ধকে তাঁরা কুফরি, শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ বলেই মেনে নিয়েছিলেন 'জিয়েঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'ই ছিল যাদের যুদ্ধের মূলনীতি। এই যুদ্ধে তাঁরা গাজির মর্যাদা লাভ করেছেন বলেই মনে করতেন। মুসলমানরাই আওরঙ্গজেবকে 'আলমগীর' বানিয়েছিলেন। আর রাজপুতেরা প্রমাদ গুণছিলেন। যুদ্ধ-অশান্তি শেষ হওয়ার পর রাজপুত রাজারা বাদশাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বাদশাহ তাদের ক্ষমা করে দেন।

এ থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কত গাঢ় ছিল। তাঁদের সওয়ারিতে রাজপুতেরা অংশ নিতেন এবং দশহরা ইত্যাদি

www.pathagar.com

হিন্দু পর্বগুলোতে বাদশাহ ইনাম, পোশাক, ঘোড়া, হাতি, গরু ইত্যাদি হিন্দু সরদারদের প্রদান করতেন— এ কথা ইতিহাস বলে।

প্রারম্ভে যখন রাজপুতদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি হয় তখন তারা মসজিদ ভাঙতে শুরু করে দেয়। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে বাদশাহ হিন্দুদের মন্দির ভাঙার আদেশ দেন। সাল ১৬৭২ ঈসায়ীতে সৎনামী বিদ্রোহে ৫০০০-এর বেশি লোক মারা যায়, যার ফলে শিখদের ধর্মগুরু তেজবাহাদুরকে, ১৬৭৫ ঈসায়ীতে গ্রেফতার করে তাকে যাতনা দেন।

সাল ১৬৭৮ ঈসায়ীতে জসবন্ত সিংহ শাহি সেবায় কর্মরত থাকাকালে পেশোয়ারে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর এবং রাজপুতদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। তখন বাদশাহ আজমীঢ়ের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান। সেখানে তিনি যোধপুর জব্ধ করে, সেখানকার রাজক্ষমতা জসবন্ত সিংহের দূর-সম্পর্কের এক ভাইপোকে ৩৬ লক্ষ টাকায় বিক্রি করে দেন। কিন্তু রাঠোর সরদার তার প্রভুর ক্ষমতার এ হীন দশা সইতে পারলেন না। ফলে, তিনি দুর্গাদাসের নেতৃত্বে বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা বুলন্দ করেন। সে ক্ষেত্রে তিনি বেশ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তিনি যোধপুরের প্রকৃত ওয়ারিস অপ্রাপ্ত বয়স্ক অজিত সিংহকে নিজের অভিভাবকত্বে রেখে দেন। অন্য রাজপুতরা রাণা রাজসিংহের নেতৃত্বে বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে অস্থির করে তুলতে থাকেন। এভাবে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন আলমগীরের চতুর্থ পুত্র আকবর ১৬৮১ ঈসায়ীতে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার এ ধারবাহিকতা জাহাঙ্গীর থেকে চলে আসছিল। সেই পথ ধরে শাহজাহান, আওরঙ্গজেব এবং এবার তাঁর চতুর্থ পুত্র আকবর। বিচক্ষণ আলমগীর এটা জানতেন যে, তাঁর পুত্ররাও এটা তাঁর বিরুদ্ধে করবে। সে জন্য তিনি সদা সতর্ক থাকতেন এবং তাঁদের ওপর কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এতটা সাবধানতা সত্ত্বেও তাঁর চতুর্থ পুত্র পিতার কাছ থেকে সিংহাসন অধিকার করে নেওয়ার জন্য বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তার পিছনে রাজপুতদের পুরো সহযোগিতা ও ষড়যন্ত্র ছিল। আকবরের মাতুল কুলের রাজপুতরাও সমানে অংশ নিয়েছিল। আওরঙ্গজেব তা দেখে ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাঁকে বুঝিয়ে দিল এমতাবস্থায় কী করা উচিত। তিনি ছিলেন রাজনৈতিক পাশা খেলার পাক্কা খেলোয়াড়। কোন গুটি কোথায়

www.pathagar.com

চাললে কিস্তিমাত করা যায় তা তিনি ভালোমতই জানতেন। তিনি তাই করলেন। আকবরের হস্তাক্ষর নকল করিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে তাঁকে লেখা পত্র তিনি নিজেই লেখালেন— 'রাজপুতেরা আমাদের রাজ্যের প্রতি এবং বিশেষ করে আপনার প্রতি যে বিদ্রোহ খাড়া করেছে— এ কথা আমি সব সময় বলে এসেছি। আমার কর্তব্য পালন করতে প্রধান প্রধান রাজপুত ও সেনানায়কদের নিয়ে অবিলম্বে আমি আপনার সমক্ষে এসে হাজির হচ্ছি যাতে আপনি তাদের ঔদ্ধত্যের উপযুক্ত দণ্ড দিতে পারেন। এরপরই, আপনি বুঝতে পারবেন আমার পিতৃভক্তি ও আপনার প্রতি আমার বিশ্বস্ততার পরিচয়।'

এই পত্র লেখার পর আওরঙ্গজেব তাঁর বিশ্বস্ত গুপ্তচরদের ডেকে পাঠালেন। এই পত্র দিয়ে তিনি তাদের আকবরের ছাউনিতে পাঠিয়ে দিলেন এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আকবরের রাজপুত সরদারদের গ্রেফতার করার বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়ে দিলেন যাতে এই পত্র পাঠ করে আকবরের ঐক্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

এই তদবির সফল হলো। পরিণামে রাজপুতেরা আকবরের পক্ষ ত্যাগ করে চলে গেল। আকবরের হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও তারা আর ফিরল না। এ ছিল বাদশাহ আলমগীরের ঠগবিদ্যা। ব্যর্থ হবার ছিল না। আকবর রাজপুত সরদারদের হাজার প্রকারে বোঝানোর চেষ্টা করলেন যে, এ কাজ তাঁর নয়; স্বয়ং তাঁর পিতা আওরঙ্গজেবের কারসাজি। তিনি আগের মতোই তাঁদের প্রতি বিশ্বস্ত আছেন। তা সত্ত্বেও কিছুতেই কিছু হলো না। অবশেষে, পরাজিত-পরাভূত হয়ে তিনি ইরানের শাহের কাছে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এখানে পূর্ব ইতিহাসের প্রতি একটু দৃষ্টি নিক্ষেপের প্রয়োজন। মোগল সম্রাটদের ইরানের শাহের আশ্রয়প্রার্থী হওয়া কোনো নতুন ঘটনা নয়। এ ধারাক্রম বাবর থেকে শুরু হয়েছিল। ভগ্ন হৃদয় বাবর তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী উজবেক নেতাকে দমানোর জন্য ইরানের শাহের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। শাহ তাকে আর্থ-সামাজিক ও সামরিক সহযোগিতা দিয়েছিলেন। বাবর-পুত্র হুমায়ূন তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী শের শাহের দ্বারা পরাজিত ও বিতাড়িত হয়ে অনেক দুঃখকষ্ট সয়ে ইরানের শাহের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনিও বিমুখ হননি। মূলত, তাঁর সাহায্য পেয়েই তিনি মোগল সালতানাত পুনরুদ্ধারে সমর্থ হয়েছিলেন। আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে দূত বিনিময় ও সহযোগিতার ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে কান্দাহার প্রশ্নে শাহ আব্বাসের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়। এ ধারা শাজহাজান পর্যন্ত চলে আসে। শাহজাহানের পুনঃপুনঃ

www.pathagar.com

কান্দাহার অভিযান ব্যর্থ হয়। এবং কান্দাহার চিরতরে হিন্দুস্তানের হাতছাড়া হয়ে যায়। পরে, আওরঙ্গজেব ভারত সম্রাট হলে তাঁর চতুর্থ পুত্র আকবর পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইরানের শাহের আশ্রয়ে চলে যান।

আকবর সেখানে আলমগীরের মৃত্যুর অপেক্ষায় দিনগুজরান করতে থাকেন যাতে ইরানের শাহের সহযোগিতায় তিনি মোগল সালতানাতের সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে পারেন।

আর্যাবর্তের আমজনতা ও সুরাটে কুঠি নির্মাণ করে বাণিজ্য করা ইংরেজরাও মনে করত আওরঙ্গজেবের পর আকবরই মোগল সাম্রাজ্যের পরবর্তী অধিষ্ঠাতা হবেন। এই কারণে মাড়োয়ারি বুদ্ধিধারী ইংরেজ বেনিয়ারা আকবরকে গোপনে সাহায্য-সহযোগিতা করতে থাকে। এর পিছনে ছিল তাদের ভবিষ্যতের সুযোগ-সুবিধা লাভের ব্যাপক পরিকল্পনা। কোনো শক্তিশালী সম্রাটের কাছ থেকে সে সুবিধা পাওয়াটা ছিল বহুত দূর অস্ত্।

আকবরের ওপর ইরানের বাদশাহের পূর্ণ মেহেরবানি ছিল। ফলে, শাহ তাঁর এক কন্যার বিয়ে আকবরের সাথে করিয়েছিলেন। ওই সময়ে ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্য বাড়ানোর কোনো সুযোগ নিতে পিছপা হতো না।

যে সময়ে বাদশাহ আওরঙ্গজেব সাম্রাজ্যের সীমা বাড়ানোর কাজে নিয়োজিত ছিলেন এবং পুরো দেশ জুড়ে নিজের শাসন পাকাপোক্ত করে গড়ে তুলছিলেন। ওই সময়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠারা মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছিল এবং মারাঠারা ধীরে-ধীরে স্বাধীন হয়ে ওঠার জন্য প্রয়াস করে চলেছিল। ওই সময়ে শিবাজী নামে একজন লোক ভারতে হিন্দুরাষ্ট্র কায়েমের অলীক স্বপ্নে বিভোর হয়ে হিন্দু সিপাই ও লড়াকুদের ঐক্যবদ্ধ করে তুলছিল।

উক্ত শিবাজীকে নিয়ে হিন্দুত্ববাদী লেখক ও ঐতিহাসিকেরা অনেক আস্ফালনজনিত কর্মকাণ্ড ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তা এ প্রসঙ্গে কিছুটা উল্লেখযোগ্য।

দুর্ভাগ্য কিংবা সৌভাগ্য বশতই হোক, ওই লোকটার নাম ইতিহাসে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে জুড়ে গেছে। ফলে এক অখ্যাত অজ্ঞাত পাহাড়ি ইঁদুর সাম্রাজ্যের মানচিত্র কাটার কাজে নিজের নখদন্ত ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যায়।

শিবাজী, যার নাম শিব বা শিবা। ওই দেশের সাধারণ নিয়মানুসারে, ইজ্জত-সূচক শব্দ 'জী' যেমন 'বাঈ' কিন্তু ইজ্জত সূচক 'জী' জুড়ে গিয়ে হয়ে

www.pathagar.com

গেছে 'বাঈজী'। ওই রকমই 'শিব' বা 'শিবা' তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে শিবাজী নামে পরিচিতি পায়। তার জন্ম হয় ১৬২৭ ঈসায়ীতে শিবগড় গ্রামে। শিবাজী একজন ইতর গোছের চালাক লোক ছিলেন। এই চালাকিকে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা বীরত্ব ব্যঞ্জক হিসেবে দেখিয়েছেন। বিষয়টি পরে পরিষ্কার হবে। দাদা কোণ্ডদের এবং মা জীজাবাঈয়ের হাতে তিনি মানুষ হন। পরে তার মধ্যে হিন্দুত্ববাদী ভারত ভাবনা গড়ে ওঠে। এতে গুরু রামদাস ও রামায়ণ-মহাভারতের বীরগাথার প্রসঙ্গও এসেছে। শোনা যায়, তিনি যুদ্ধকলাও শিখেছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, মোগল সাম্রাজ্যের মানচিত্রের পাতা কাটার জন্য ইঁদুরের মতো নিজের দন্ত-নখরে শান দেওয়া।

শিবা যুবাবস্থায় পৌঁছাতেই দাক্ষিণাত্যের পাহাড়ি উপত্যকায় বসবাসরত লুটেরা ও দস্যুদের একত্রিত করে একটি লুটেরা ও খুনে বাহিনী তৈরি করেন। শিবার পিতা শাহা, স্থানীয় ইজ্জত-বাচক শব্দ যোগ করলে যা হয় শাহাজী মুসলমান বাদশাহের অধীনে চাকরি সূত্রে সেবক ছিলেন এবং বাদশাহর পক্ষ থেকে শাহা আশপাশের প্রদেশগুলো থেকে চৌথা জমা করতেন। ধীরে ধীরে শিবা কেল্লাগুলোর ওপর দখল নিতে জাল বানাতে শুরু করেন এবং আরো কিছু ছোট-বড় কেল্লা দখলে নিয়ে কোংকনের উত্তর রাজ্যের ওপর দখলদারি নেন। রায়গড় দুর্গকে তিনি তার মুখ্যালয় করে নেন। বিজাপুরের আদিলশাহ তার এই কর্মকাণ্ডে চকিত হয়ে ওঠেন এবং এদিকে দৃষ্টি রাখতে শুরু করেন। কিন্তু শিবা চাতুরির আশ্রয় নিয়ে বাদশাহ শাহজাহানের মৈত্রী দেখিয়ে বিজাপুরের শাহকে বন্দী করে ফেলেন এবং তার বন্দী পিতাকে ছাড়িয়ে নেন।

এরপর শিবা বিজাপুরের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতায় অবতীর্ণ হন। আদিল শাহের পর অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাদশাহ সিকান্দার সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি তার ক্রমবর্ধমান শত্রু নয়া দুশমনকে দমনের জন্য আফজল খাঁকে পাঠান। শিবা বীর সেনাপতি আফজল খাঁকে একান্ত সাক্ষাতের জন্য আহ্বান করে তাঁর বুকে ছুরি মেরে তাঁকে হত্যা করেন। এটা ছিল একজন অসভ্য, ইতর, বর্বর এবং কাপুরুষের মতো কাজ। সভ্য সমাজ এ ধরনের অপকর্মকে ঘৃণা করে। ভারতের ইতিহাসে সম্ভবত এরকম কলঙ্কিত, আহুত ব্যক্তিকে তা সে যত শত্রুই হোক না কেন তাকে হত্যা সায় দেয় না। এটা শুধুমাত্র খুনি, ডাকাত, নীতিহীন এবং চোর-বাটপাড়ের পক্ষেই সম্ভব।

যাই হোক, এই আকস্মিক ঘটনায় সেনাপতিবিহীন বিজাপুরী বাহিনী বিশৃঙ্খল হয়ে যায়। শিবা তার ডাকাতি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার সুযোগ পান।

www.pathagar.com

লুটেরা শিবা তাদের সমস্ত রসদসামগ্রী লুট করেন। লুটের মালের জোরে শিবার শক্তি দিনকে দিন বাড়তে থাকে।

এভাবে বিজাপুর থেকে নিবৃত্ত হয়ে শিবা মোগল প্রদেশগুলোর ওপর চড়াও করতে শুরু করলেন। 'হিন্দুরাজ' কায়েমের স্বপ্নে বিভোর শিবা কিছু মারাঠি ও পাহাড়ি হিন্দু বর্বর শ্রেণির লোকদের ঐক্যবদ্ধ করে মোগল প্রদেশগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করলেন। পাহাড়ি দস্যু-ডাকাতদের সহায়-সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে ডাকাতি ও দস্যু পেশার লোকদের দিয়ে মোগল স্বার্থে– প্রকৃত অর্থে ভারতের জাতীয় স্বার্থ, ঐক্য ও সংহতির ওপর হামলা চালাতে লাগলেন। এ বিষয়ে এ যুগের আলোকে বিচার করলে অবশ্যই বলতে হবে যে, শিবা যদি এ যুগের লোক হতেন এবং ভারত রাষ্ট্র ও দিল্লির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও দস্যুবৃত্তি চালিয়ে যেতেন তাহলে বর্তমান ভারত রাষ্ট্র কি তাকে আদর করত? এ যুগের ইন্দিরা গান্ধী ও ভারত রাষ্ট্র বিদ্রোহী শিখ নেতা ভিন্দ্রানওয়ালেকে কি আদর করেছিল? প্রকৃত অর্থে শিবা এই রকমই দস্যু, ডাকাত ও দেশদ্রোহী বলে অভিহিত হবার যোগ্য। এ যুগের ভারতরাষ্ট্র নিশ্চয় তাকে ক্ষমা ও আদর করত না। তা সত্ত্বেও একদল উগ্র হিন্দুবাদীর দ্বারা শিবাকে 'বীর' আর 'ছত্রপতি' বানানোর কী জঘন্য প্রয়াস!

আওরঙ্গজেব শিবা নামক পাহাড়ি ইঁদুর ও দস্যুকে দণ্ড দেওয়ার জন্য শায়েস্তা খাঁকে পাঠালেন। ১৬৬৩ ঈসায়ীতে শায়েস্তা খান যখন পুনেতে অবস্থান করছিলেন তখন শিবা কাপুরুষের মতো বেশ বদল করে মোগল সরদারের বেশে তাঁর ঘরে ঢুকে তাকে আহত করে বুনো শৃগালের মতো পালিয়ে যান। এভাবে তস্কর শিবা পালিয়ে নিজের কেল্লায় চলে গেলেন।

এরপর দস্যু শিবা, ১৬৬৪ ঈসায়ীতে সুরাটে আক্রমণ চালালেন এবং একচল্লিশ দিন ধরে লুটপাট চালিয়ে নিজের দস্যু নাম সফল করলেন। এই চুরি-ডাকাতিতে শিবা প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করলেন। ওই সময়ে সুরাটে ফরাসি ও ইংরেজ বণিকেরা থাকত এবং তারা তাদের কুঠিগুলোকে কামান বন্দুক চালিয়ে দস্যু শিবা ও তার লুটেরা বাহিনীর কবল থেকে রক্ষা করল। বিদেশি বণিকদের কামান বন্দুকের ঘায়ে পালিয়ে গিয়ে দস্যু শিবা সমগ্র সুরাট শহরে লুটতরাজ, খুন ও ধর্ষণ চালালেন। এ সময় ভরোচ শহরও এই দস্যু-ডাকাতদের হাত থেকে রেহাই পেল না।

আওরঙ্গজেব রাজা জয়সিংহকে পাঠালেন। তিনি শিবার সঙ্গে সন্ধি করে দিল্লি আসার আমন্ত্রণ জানালেন। দস্যু শিবা তা স্বীকারও করলেন এবং

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের দরবারে হাজিরা দিলেন। আওরঙ্গজেব এ সময় এমন একটা ভুল করলেন যার পরিণাম তাঁকে আজীবন ভুগতে হলো। এ ঘটনায় ইতিহাস তাঁকে ক্ষমা করেনি। বিদেশি ঐতিহাসিকেরাও বিশেষত কার্লমার্কসের মতো পণ্ডিত বুদ্ধিজীবী ও ভারত-ইতিহাসের বিশ্বখ্যাত পর্যবেক্ষক কার্লমার্কস এ ঘটনায় তাঁকে 'ইডিয়ট' বলতেও দ্বিধা করেননি। কুখ্যাত দস্যু, যিনি ইতিপূর্বে অসংখ্য অপকর্ম, হত্যাকাণ্ড ও দেশদ্রোহী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত ছিল, সেই দস্যু, যা-কি-না বিষাক্ত সাপ অথবা ক্ষ্যাপা শৃগালের চেয়ে ধূর্ত ও ভয়ংকর, তাকে তিনি তৎক্ষণাৎ বিচার ও নিকেশের ব্যবস্থা না করে তাকে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দিলেন। ইঁদুর যেমন চালা কেটে পালিয়ে যায়— এই ধূর্ত শৃগালও সেইভাবে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আওরঙ্গজেবের পূর্বপুরুষ বাবরের হাতে যদি ধোঁকাবাজ রাণা সাঙ্গা ধরা পড়তেন, তাহলে তিনি কি তাকে নিকেশ না করে বন্দীশালায় পাঠিয়ে দিতেন? দ্বিতীয় মোগাল সম্রাট হুমায়ূন কি হিমুকে আদর করে বন্দীশালায় বন্দী করতেন? আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহজাহানের মতো বিচক্ষণ সম্রাটগণ কি তাঁদের ঘৃণ্য শত্রু এবং দুস্কৃতিকারীদের আদর করেছিলেন? কিংবা শিবা যদি এ যুগের লোক হতেন এবং দিল্লির বিরুদ্ধে এ ধরনের ইতরামো, দস্যুবৃত্তি, বিদ্রোহ ও চোট্টামি করতেন, ভারত সরকার কি তাকে আদর করত? অপরাধের উপর্যুক্ত বিচার এবং দণ্ডবিধানে অলসতা করলে পরিণামে যেমন ভুগতে হয় তেমনই ভুগতে হয় আওরঙ্গজেবকে। তিনি তাঁর এই ভুলের জন্য নিজেকেও ক্ষমা করতে পেরেছিলেন কি-না সন্দেহ।

দস্যু শিবা দাক্ষিণাত্যের দিকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৬৭১ ঈসায়ীতে শিবা দ্বিতীয়বার সুরাট লুট করলেন। খান্দেশে মোগল সেনাকে হারিয়ে শিবা নর্মদা নদী পর্যন্ত তার দস্যুরাজ কায়েম করলেন, কয়েকটি কেল্লার ওপর আধিপত্য কায়েম করে তার রাজ্য বিস্তার করে নিলেন। শিবা ছিলেন একজন প্রতিভাবান দস্যু। এই দস্যুনেতা তার রাজ্যকে সুব্যবস্থিত করে তুলছিলেন। এরই মধ্যে একদিন ভয়াবহ উদরাময় যা ডায়রিয়া নামে পরিচিত আক্রান্ত হয়ে জীবন নদী পেরিয়ে গেলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই শিবা লুটতরাজ, গণহত্যা ও খুন-ধর্ষণের মাধ্যমে যে রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন, তা ছিল তার হিন্দু রাষ্ট্র সাধনার সাকার রূপের কল্পনা। সে রাজ্যের আদর্শ কী ছিল সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন। কোনো রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলনীতি কী হওয়া উচিত? আর তার ভিত্তিই বা কী হওয়া উচিত? রাষ্ট্র ব্যবস্থার

www.pathagar.com

আইন থাকতে হবে এবং সে আইনের নীতি হলো সম-ব্যবস্থা। অর্থাৎ অপরাধী যত বড়ই হোক না কেন, তার বিচার হতে হবে। আইনের প্রয়োগ হবে সবার ক্ষেত্রে সমান। দ্বিতীয়ত, পোক্ত বিচার ব্যবস্থা থাকতে হবে। আইনের ভিত্তিতে বিচারক যার বিচার করবেন। তৃতীয়ত, প্রজাদের নিরাপত্তা ও শান্তি বিধান। ধর্মের ভিত্তিতে ক্ষমতাবান ক্ষমতাহীনের ওপর কোনো অত্যাচার করতে পারবে না। সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে কোনো ক্ষমতাবান কোনো সংখ্যালঘুর ওপর তার ধর্মীয় বিধান চাপিয়ে দিতে পারবে না। দিলে সে অপরাধী বলে গণ্য হবে এবং আইনের চোখে তার বিচার হতে হবে। এটা কি শিবার রাজ্যে সম্ভব ছিল? ধর্ম, জাতি ও সভ্যতার কোন আইনের উত্তরাধিকারী ছিলেন তিনি? তিনি যে হিন্দুরাজ্য কায়েম করেছেন বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করতেন সেই রাজ্যের হিন্দুরা কি সভ্যতাচার ও শিষ্টাচার আশা করতে পারত তার কাছে? সাপের মতো হিংস্র, খল একটা বিষাক্ত সরীসৃপ প্রাণী যাদের দেবতা, বনের চতুষ্পদ ও তৃণভোজী গৃহপালিত পশু যাদের দেবতা, জন্মগত শ্রেণিত্বের আশীর্বাদ ও জন্মগত নিকৃষ্টত্বের বিধান যে ধর্মের রীতি— তারা কার প্রতি কবে সভ্যতা করেছিল। আর কী যোগ্যতাই বা রাখতে পারত। এই যেখানে বাস্তব অবস্থা সেখানে তারা কার প্রতি কোন ন্যায়বিচার করার যোগ্যতা রাখতে পারত বা পারে? যে অবস্থা ভারতে আজও বিদ্যমান— তারা যদি হয় হিন্দু রাষ্ট্রের বাহক ও চিন্তানায়ক তাদের রাজ্যে খুন-ধর্ষণ-লুট, অত্যাচার আর অসভ্যতাচারে সয়লাব হয়ে থাকে। শিবার হিন্দু রাজ্যে এর বেশি আশা করা যেত না। সুতরাং তার মৃত্যুর সাথে সাথে তার হিন্দু রাজ্যের স্বপ্ন রঙিন ফানুসের মতো উড়ে গেল।

প্রশ্ন ওঠে, শিবা ব্রাহ্মণ ছিলেন, ক্ষত্রিয় ছিলেন, না শূদ্র ছিলেন? অধিকাংশেরই মত তিনি শূদ্র ছিলেন। হিন্দু সমাজে ব্রহ্মার পদতলে শূদ্রদের স্থান দেওয়া হয়েছে, অর্থাৎ তাদের অচ্ছুৎ করে রাখার বিধানই হিন্দু ধর্মের বিধান। এই যেখানে বাস্তবতা সেখানে শূদ্র শিবা হিন্দু সমাজের কী করতে পারতেন? আর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তা কীভাবে নিত? তবে, এ কথা স্বীকার্য যে, তিনি তাঁর সরদারদের নগদ অর্থে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

তবে, যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি যুদ্ধরীতিতে নয়া কৌশলের আশ্রয় নেন। প্রকাশ্য ময়দানে নেমে যুদ্ধ করার ক্ষমতা, শক্তি ও যোগ্যতা তার ছিল না। তাই চোরাগোপ্তা আক্রমণের রীতি পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। অকস্মাৎ অপ্রস্তুত একজন মানুষকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে চোর, দস্যু বা ডাকাত যেমনটি করে আর

www.pathagar.com

কী। কেউ কেউ এর আবার গালভরা নামও দিয়েছেন— 'গেরিলা যুদ্ধ'। কেউ কেউ বলেন, এটা শিবাজীরই উদ্ভাবন। কিন্তু এ কথা সর্বৈর্ব অগ্রাহ্য। কেননা, কান্দাহার দুর্গ অভিযানকালে স্থানীয় পাহাড়ি চোর ডাকাতরা মোগল বাহিনীর ওপর এই কায়দায় হামলা চালিয়ে তাদের রসদ সামগ্রী লুট করেছিল। শিবা চোর-ডাকাতদের এই কৌশল নিজের বাহিনীতে অবলম্বন করেছিলেন। সুতরাং এটা শিবার দ্বারা উদ্ভাবিত কোনো পদ্ধতি নয়।

হিন্দুত্ববাদীদের দ্বারা শিবার অনেক প্রশংসা কীর্তন হয়েছে। শিবার রাজ্যে গোমাংস ভক্ষণকারী অহিন্দুদের সঙ্গে শিবার আচরণ কেমন ছিল তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। নারীর অধিকার তথা সতীদাহ প্রথার বিষয়ে তার কী অবস্থান ছিল তাও জানা যায় না। তবে, এ কথা জানা যায় যে, তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সমান্তরালে একটি হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। অথচ মোগল সাম্রাজ্য ইসলামি সাম্রাজ্য ছিল না। তা ছিল জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে একটি জাতীয় সাম্রাজ্য। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্রীয় মহাসংঘ। এখানে সমস্ত জাতি ধর্মের মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার পালন করত। শুধু তাই নয়; বরং তাতে মোগল সম্রাটগণও সমভাবে অংশগ্রহণ করতেন। এই সাম্রাজ্যের একটি নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি ছিল। সে জন্যই তা শতাধিক বর্ষব্যাপী স্ব-মহিমায় বিরাজিত ছিল এবং তার ধারাও প্রগতিপূর্ণ ছিল। এর বিপরীতে শিবার হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন ছিল সিন্ধুতে বিন্দুর সমান অস্থায়ী। শিবার রাজ্য দেশের রাজপুতদেরও আনতে পারেনি। রাজপুতেরা এই জাতীয় সাম্রাজ্যের সেবক, সংগঠক ও সমর্থক ছিলেন। তারা মোগলদের সঙ্গে আন্তধর্ম বিয়ে, সামাজিক সম্পর্ক, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিকই, শিবার তথাকথিত হিন্দুরাষ্ট্রের স্বপ্ন তাদের কাছে একটি অলৌকিক কল্পনা বলেই বিবেচিত হতো। ফলে হিন্দু শিবা তার জাতভাই হিন্দু রাজপুতদের কাছে আশ্রয়-প্রশ্রয়, সমর্থন কোনোটাই পাননি। এর দ্বারা বোঝা যায় শিবার আকাঙ্ক্ষিত হিন্দুরাষ্ট্রের কোনো নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তি ছিল না। তা ছিল স্বপ্নে বিরিয়ানি রান্নার মতো অলৌকিক ব্যাপার। সেখানে ঘি দিতে কঞ্জুসি করা না হলেও তা খাওয়ার সময় সারি সারি গোলাপি হাতির মতো আকাশে মিলিয়ে যাওয়ার মতো ব্যাপার। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ঐতিহাসিক লেখকেরা শিবার এই ব্যাপারটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছেন যে, তা একসময় ফেটে চৌচির হয়ে যাবার মতো ব্যাপার হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

শিবা মারা গেলেন। সাথে সাথে তার সাম্রাজ্যও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল এবং ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

'শিবাজী' ওরফে শিবা, যেমনটি এখানে লেখা হয়েছে, আওরঙ্গজেব তাকে 'শিবা' বলতেন। আমরাও তাই লিখেছি। তার পুত্র 'শম্ভা'। ইতিহাসে শম্ভাজী লেখা হয়েছে। ওই দিককার নিয়ম অনুসারে নামের সঙ্গে 'জী' যোগ করে 'শম্ভাজী' বলা হয়। আমরা এখানে শম্ভা লিখব। যেমনটি তার প্রকৃত নাম। শিবার পর তার পুত্র শম্ভা তার স্থলাভিষিক্ত হন। আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবর কীভাবে পালিয়ে তার শরণে এসে পরে ইরানে পালিয়ে গিয়েছিলেন তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। দাক্ষিণাত্যের অবস্থা দেখে বাদশাহ আলমগীর সেনা পরিচালনার ভার স্বহস্তে তুলে নিয়ে এই অভিযানের নেতৃত্ব নিজেই গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য অভিযান

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য অভিযানে প্রস্থান করলেন।

এ সময়ে মোগল তথা আওরঙ্গজেবের সেনা ব্যবস্থা কেমন ছিল তার ওপর আলোকপাত করা যাক।

বাদশাহের সেনা এত বিশাল ছিল যে, তারা যখন কোনো অভিযানে বেরুত তখন মনে হতো একটি চলমান শহর একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে হেঁটে চলেছে। শাহি ছাউনির বর্ণনা আরো আকর্ষক। অভিযানে বাদশাহর সঙ্গে সারা বছরের পানাহার ও পরিবার-পরিজন সবাই থাকত। সেনাবাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা আশপাশের গ্রামগুলো থেকে করা হতো। একটি মেলার সমান বড় এই ছাউনিতে সকল প্রকারের বস্তু সামগ্রী পাওয়া যেত। বিভিন্ন দিককার বেপারি ও ফেরিওয়ালারা এই ছাউনিতে তাদের মালপত্র বেচতে আসত। এ হতো মোগল সাম্রাজ্যের অধিষ্ঠাতা সম্রাটের ছাউনি। এখানে কোনো দ্রব্যসামগ্রীর অভাব রাখা হতো না। বাদশাহ স্বয়ং যেখানে থাকতেন সেখানে একই প্রকারের ছাউনি নির্মাণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ রাখা হতো। প্রত্যেক কর্মকর্তার তাঁবু ইত্যাদি একটি বিশেষ এবং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা হতো। এক স্থানে এক কর্মকর্তার তাঁবু ফেলা হলে, অন্য স্থানে ঠিক এতটা দূরত্বেই ঠিক ওই রকমেই তাঁবু লাগানো হতো। বাদশাহর তাঁবু একটি বিশেষ জায়গায় নির্দিষ্ট থাকত।

শাহি বাহিনীর প্রস্থান করার রাস্তা আগেই মেপে নেওয়া হতো। শিবিরের দূরত্ব এবং পানি ইত্যাদির প্রয়োজনীয় সাধনের বর্ণনা বাদশাহের কাছেই রাখা হতো। সবকিছু নিশ্চিতভাবে বুঝে-সুঝে নেওয়ার পর এবং রাস্তার কষ্ট-অসুবিধা ইত্যাদি দূর করার উপায় করে তবেই সামনে এগিয়ে চলার আদেশ হতো।

সেনা অত্যন্ত বড় হওয়ার ফলে বাদশাহকে বিপুল পরিমাণ খরচ বহন করতে হতো। এমনও বলা হয় যে, তাঁর সেনায় অসংখ্য উট, খচ্চর ছাড়াও

www.pathagar.com

৫০০ থেকে ৬০০ হাতিও থাকত। এ সবের জন্য বিপুল পরিমাণ খরচও তাঁকে বহন করতে হতো। তা ছাড়া বাদশাহ সালামতের হাতির জন্য তো বিশেষ খাদ্য হিসেবে মলিদা, ঘি, মিছরি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা হতো।

মোগল বাদশাহগণ অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন হতেন এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থান করতেন। নিজেদের এই অবস্থানকে কোনো বাদশাহই অসম্মানিত হতে দেননি। বাবর থেকে আওরঙ্গজেব কেউই এর ব্যত্যয় হননি। অথচ তাঁদের আমির-উমরাহসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাঁদের প্রতি অখণ্ড আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। মোগল বাদশাহগণ তাঁদের অধীনস্থদের যাঁর যা মর্যাদা সে মর্যাদাও কখনো ক্ষুণ্ন হতে দেননি। মোগল বাদশাহগণ দেশের প্রজাসাধারণের মা-বাপস্বরূপ হতেন। তাদের প্রতি সামান্য অন্যায়-অত্যাচারকেও তাঁরা প্রশ্রয় দিতেন না। এ ধরনের অত্যাচারীদের তারা যথোচিত দণ্ড প্রদান করতে পিছপা হতেন না। এমনকি, সাম্রাজ্যের পশুপাখি, বৃক্ষলতাদিও নিরাপদ ছিল তাঁদের সাম্রাজ্যে। অন্যায়ভাবে বৃক্ষ কর্তন ও পশুপাখি নিধনের অনুমতি হতো না সে সাম্রাজ্যে। সবাই সহি-সালামতে জীবন নির্বাহ করত।

আগেই বলা হয়েছে, সাম্রাজ্যের কাউকে বাদশাহর বরাবরি করতে দেওয়া হতো না। বাদশাহর স্থান সবার ওপরে থাকত।

বাদশাহ যখন হাতির পিঠে সওয়ার হতেন তখন আমির-উমরাহগণ ঘোড়ায় সওয়ার হতে পারতেন। আর বাদশাহ যখন পালকিতে সওয়ার হতেন যখন তাঁদের পায়ে হেঁটে চলতে হতো। বাদশাহর বিনা হুকুমে কেউই উঁচু সওয়ারিতে আসীন হতে পারতেন না। বাদশাহ খুবই উচ্চমানসম্পন্ন হতেন এবং লোকেরা তাঁকে উচ্চ স্বরূপে দেখত, মানুষ যেমন উচ্চে সূর্যকে দেখে তেমনই। বাদশাহ কথা বললে আমির-উমরাহগণ দু'পাশ থেকে হাত তুলে 'অহা করামত, অহা করামত' উচ্চারণ করতেন।

এভাবে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে বাদশাহ সালামত ১৬৮২ ঈসায়ী সালে, দাক্ষিণাত্যে তাঁর মুখ্য নগর ঔরংগাবাদ পৌঁছালেন। সেখান থেকে আহমদনগর গেলেন। দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের শিয়া মুসলমান রাজারা তাঁর সঙ্গে ঠিকমতো সদ্ব্যবহার রাখতেন না। তিনি তাদের নিজের শত্রুজ্ঞান করে তাদের দণ্ড প্রদান করাকে কোরআনের বিধান অনুযায়ী ফরজ বলে মনে করতেন। ১৬৮৫ ঈসায়ী সালে তাঁর সেনা বিজাপুর অবরোধ করল। এর মনোরঞ্জক বর্ণনা পাটনা নগরের ইতিহাসকার ঈশ্বরদাস তাঁর ফার্সি গ্রন্থে বেশ

www.pathagar.com

আকর্ষণীয় ঢঙে দিয়েছেন। ১৬৮৬ ঈসায়ী সালে আদিলশাহি বংশের অন্তিম শাসক সিকান্দর তাঁর শরণে চলে আসেন। ফলে বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্যের অধীনে এসে যায়। গোলকুণ্ডাও ১৬৮৭ ঈসায়ী সালে একইভাবে মোগল সাম্রাজ্যের অঙ্গ বনে যায়।

শিবা-পুত্র শম্ভাকে ১৬৮৯ ঈসায়ীতে কয়েদ করে নেওয়া হয়। সাম্রাজ্যের দৃষ্টিতে শম্ভা অপরাধী ছিল। সে তাঁর বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয় দিয়ে প্রকৃতপক্ষে মহান মোগল অধিপতির প্রতি ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিল। তার বাবা শিবার প্রতি উদারতা দেখিয়ে আওরঙ্গজেব যে ভুল করেছিলেন তার জন্য তাকে দেশ-বিদেশে নিন্দার ভাগী হতে হয়েছিল, সর্বোপরি তার দুষ্পরিণাম তাঁকে আজীবন ভুগতে হয়েছিল। সেই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে– 'বুনো শৃগালের বাচ্চা তার স্বভাব প্রকৃতিই গ্রহণ করে'– এই প্রবাদবাক্য অনুযায়ী তার শাস্তি বিধানে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব তিনি করলেন না। অগত্যা তাকে নিকেশ করে দেওয়া হলো।

শিবার প্রতি অনুকম্পা দেখানোর বিষময় পরিণাম আওরঙ্গজেবকে ভুগতে হলেও তিনি শিবার বংশধরদের প্রতি অবিচার করেননি। তিনি পরম উদারতা দেখালেন। তাদের প্রতি তিনি সামান্যতম প্রতিশোধের মনোভাবও তিনি দেখাননি। শম্ভা-শিবার রাজধানী রায়গড় অধিকার করে নিয়ে তার পুত্র শাহুকে বন্দী করে আওরঙ্গজেব তাঁর দরবারে নিয়ে গেলেন। তার পর রাজারাম রাজা হলেন এবং তিনি ১৬৮৯-তে তাঁর মৃত্যু অবধি রাজত্ব করেন।

দাক্ষিণাত্য বিজয়ের পর সারা ভারতবর্ষ বাদশাহের অধিকারে এসে গেল এবং সর্বত্রই তাঁর অধিকার স্বীকৃত হয়ে গেল– এ থেকে এমনও প্রতীত হতে পারে যে, এই বিজয়ের পর আওরঙ্গজেব সার্বভৌম সাম্রাজ্যের সম্রাট পদ ভোগ করতে লাগলেন। তবে, আরেকটু গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, এই সময় থেকে সাম্রাজ্যের অবনতির সূচনা হয়। তাঁর সাম্রাজ্য এত বড় ও বিস্তৃত হয়ে উঠল যে তার ওপর এককেন্দ্রীয় প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুকঠিন হয়ে পড়ল শুধু নয়; বরং অসম্ভব হয়ে পড়ল। ভারতকে একরাষ্ট্রে পরিণত করে তাকে অখণ্ড রাখা ওই যুগে বড়ই সুকঠিন ছিল। আওরঙ্গজেব তাঁর আমির উমরাহ ও সুবেদারদের পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারতেন না। এদিকে শিবা পুত্র শম্ভার মৃত্যুদণ্ডের ফলে মারাঠারা ক্ষুব্ধ ছিল এবং দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতনের ফলে খুবই দুঃখিত ছিলেন।

www.pathagar.com

নিজের জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে আওরঙ্গজেব বহুসংখ্যক কেল্লা অধিকার করেন। অবশেষে, প্রান্ত-ক্লান্ত আওরঙ্গজেব ১৭০৫ ঈসায়ীতে বার্ধক্যের ভারে ন্যুব্জ হয়ে পড়লেন এবং আহমদনগরে ফিরে গেলেন। তারপর, ১৭০৭ ঈসায়ী সালে ৯১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করলেন। দৌলতাবাদ থেকে ৬ মাইল দূরে খুর্দাবাদে তাঁর লাশ পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে তাঁর স্বহস্তে নির্মিত মকবরায় তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন।

এভাবে এক মহান মোগল সম্রাটের ইহজীবন সাঙ্গ হয়ে গেল। মৃত্যুর কবল থেকে কে, কবে, কোথায় রেহাই পেয়েছে? রাজা-প্রজা সকলেই তার সামনে সমান।

মহান সম্রাট আওরঙ্গজেব বাল্যকাল থেকেই বড় শুদ্ধাচারী এবং সদাচারী ছিলেন। কোনো ঠাট-বাট তিনি পছন্দ করতেন না। পবিত্র কুরআনের বাণী, নীতি-নির্দেশ ও বিধিবিধান তিনি আজীবন অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলেছেন। কিন্তু বাদশাহি লাভের ফলে, বাদশাহের মর্যাদা রক্ষার্থে কিছু ঠাট তো তাঁকে মেনে চলতেই হতো। এ যুগে একজন সাধারণ ক্ষমতাভোগী মানুষ যেখানে তার নিজস্ব মর্যাদা রক্ষার্থে ঠাটবাটের চূড়ান্ত করেন সেখানে ওই যুগের কথা তো আলাদাই ছিল। আওরঙ্গজেবের দরবারের ঠাটবাট কারো চেয়ে কোনো অবস্থাতেই কম ছিল না। বাইরে থেকে আগত লোকেরা তাঁর ঠাটবাট দেখে আত্মহারা হয়ে যেত। বাদশাহর মাথার মুকুট ছিল একটি অতিশয় মূল্যবান বস্তু। যে সিংহাসনে বাদশাহ বিরাজ করতেন তার মূল্য তৎকালীন যুগের তিন কোটি টাকা বলে অভিহিত করা হয়।

প্রতিবছরে নভেম্বরের পাঁচ তারিখে, বাদশাহের জন্মদিন বড় ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হতো। ওই দিন বাদশাহকে ওজন করা হতো এবং তাঁর ওজন বাড়লে লোকদের মধ্যে খুশি ও আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত। ওজন কমে গেলে মানুষের মন খারাপ হয়ে যেত এবং তাদের মধ্যে উদাসীনতা ছেড়ে যেত। ওই দিন বাদশাহর মেহেরবানি লাভের জন্য আমির-উমরাহদের পক্ষ থেকে বড় বড় মূল্যবান বস্ত্র উপহার দেওয়া হতো। বাদশাহর সম ওজনের সমস্ত রূপা দীন-দরিদ্র মানুষদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো।

নিজের রাজ্যে সাম্রাজ্যের অধীশ্বর রূপে অনেক বস্তুর মালিক ছিলেন আওরঙ্গজেব। যেমনটি ছিলেন তাঁর পূর্বের সম্রাটগণ। এবং আধুনিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় যেমন রাষ্ট্র তেমনই। কোথাও কোনো ভূমি খনন করা হলে সেখানে বাদশাহের পক্ষ হতে নজরদারি চালানো হতো। এবং তা থেকে হীরে-জহরত

www.pathagar.com

সহ যা কিছু পাওয়া যেত তা বাদশাহর বলে গণ্য করা হতো। আওরঙ্গজেব এই প্রকারের বস্তুরাজি থেকে হীরে-মোতি সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর দুটি হীরের মূল্য ছিল যথাক্রমে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা এবং দ্বিতীয় হীরেটির মূল্য ছিল এক লক্ষ কুড়ি হাজার— তৎকালীন মুদ্রা মান অনুযায়ী। কারো কাছে হীরে-মোতি থাকলে তা বাদশাহের হুজুরে জমা করার ফরমান জারি হতো।

আওরঙ্গজেবের প্রশাসনে বহু সংখ্যক হিন্দু চাকরি করত। কিছু বড় বড় পদে হিন্দুদের রাখা হতো, যারা সাধারণত ঘুষ খেত। এ কথা যখন বাদশাহ জানতে পারেন তখন কিছুদিনের জন্য তিনি হিন্দুদের চাকরি দেওয়া বন্ধ করে দেন। তবে, পরে একজন মুসলমান পেশকার হলে একজন হিন্দু পেশকার রাখার ফরমান জারি হয়ে গেল। কেবল ধর্মান্ধতার কারণে আওরঙ্গজেব হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করেছিলেন— এ কথার কোনো ভিত্তি নেই। হিন্দু কয়েদি যখন রান্না করা খাদ্য খেতে আপত্তি করত তখন তাকে শুকনো খাদ্য ও মিঠাই দেওয়া হতো। নিজের শাহজাদাদের দেখাশোনার জন্য কিছু হিন্দু রেখেছিলেন। বৈদ্যও হিন্দু ছিল। তাঁর দরবারে সুন্দর নামক একজন নৌকর ছিল, তাকে তিনি 'কবিরায়' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। রায় লালচাঁদ নামক তাঁর এক হিন্দু আমলদার ছিলেন। তাঁকে ঠিক কাবুল অবধি একটি গুপ্তকার্যের তদন্তের জন্য বাদশাহ পাঠিয়েছিলেন। আলমগীর হিন্দুদের হাতি, ঘোড়া, গরু, ভূমি এবং গম ইনাম স্বরূপ প্রদান করতেন। সতিদাসের হাতে বাদশাহ একটি ফরমান লিখে গুজরাটে পাঠিয়েছিলেন যাতে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার প্রতি সম ব্যবহারের আদেশ ছিল। মহীশূরের রাজা চীকারাজকে কদর করে তিনি 'জগৎ দীওয়ান'-এর পদে ভূষিত করেছিলেন। কাশ্মীরে মন্দিরের পুরোহিতদের কোনো প্রকারের কাঠ না দেওয়ার ফরমান তিনি সেখানকার মুখ্য আমলদার আবুল হাসানকে পাঠিয়েছিলেন। কত হিন্দুকেই না তিনি জায়গির দিয়েছিলেন এবং বাদশাহের কাছ প্রাপ্ত হিন্দুরাজ বাংলায় বহুকাল যাবৎ বিরাজিত ছিল। বাংলায় হিন্দুদের অর্থনৈতিকভাবে আজও প্রতিষ্ঠিত থাকার মূল চাঠিকাঠি এই রহস্য এর মধ্যেই রয়ে গেছে।

রসিকদাস নামক এক কর্মকর্তার কাছে প্রেরিত এক ফরমান থেকে হিন্দুদের প্রতি আওরঙ্গজেবের ব্যবহারের কথা জানা যায়। সরকারি কর্মচারীদের প্রতি কঠোরভাবে ধমক দেওয়া হয়েছে। কাঠিয়াবাড়, জুনাগড়, সোমনাথ, পাটন ও মঙ্গলোরে কিছু শিলালিপি পাওয়া গেছে যাতে কৃষকদের হিতের প্রতি তাঁর কী কৃপাদৃষ্টি ছিল, তা নিশ্চিতভাবে জানা যায়।

www.pathagar.com

জিজিয়া কর আরোপকারী, হিন্দুদের ওপর জুলুমকারী, অত্যাচারী, ধর্মান্ধ ইত্যাদি শব্দ দ্বারা আওরঙ্গজেবকে অভিযুক্ত করে উগ্রহিন্দুত্ববাদী শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের মন বিষিয়ে দিয়ে থাকেন। এই জিজিয়া শব্দের অর্থ কী এবং এই করের জন্য মানুষের কী দুঃখ ছিল তার কোনো বিচার না করে এরকম মহান মোগল বাদশাহ সম্বন্ধে জনসমক্ষে এ রকম অপপ্রচার করা বাস্তবিকই বড় অন্যায় কাজ। ইরানের প্রসিদ্ধ তথা ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ নওশেরওয়াঁ দেশের রক্ষক সিপাইদের সাহায্যের জন্য জিজিয়া কর লাগিয়েছিলেন। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রত্যেক মুসলিমকে বা যারা সেনাবাহিনীতে চাকরি নিত তাদের এই কর থেকে মুক্ত করে দেওয়া হতো। এই রকমই ভারতবর্ষে মুসলিমরা সেনায় চাকরি নেওয়ার ফলে তাদের এই কর থেকে মুক্ত করে দেওয়া হলো, হিন্দুদের অন্য রাজ্যের প্রজাদের থেকে রক্ষার জন্য এই সেনাই কাজ করত। যার বদলায় তাদের থেকে কর নেওয়া আবশ্যক ছিল। এই জন্যে সেনাবাহিনীতে ভর্তি বা কাজ বা চাকরি না নেওয়া হিন্দুদের থেকে জিজিয়া কর নেওয়া হতো। যে হিন্দু তথা ধর্মাবলম্বী সেনাবাহিনীতে ভর্তি হতো তাদের কর দেওয়া মাফ ছিল। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, জিজিয়া ধর্মের নয় বরং রক্ষা করার বদলায় নেওয়া হতো। এর অতিরিক্ত জিজিয়ার সবচেয়ে বড় বার্ষিক করের পরিমাণ ছিল ২০ টাকা, লাখপতিকেও ২০ টাকার বেশি দিতে হতো না। মধ্যবিত্ত তথা গরিব পুরুষদের ৬ টাকা এবং ৩ টাকার অধিক কখনো দিতে হতো না। সেনার চাকরি গ্রহণকারী, সাধু, বাবা, ব্রাহ্মণ এবং কুড়ি বছরের কম এবং পঞ্চাশ বছরের অধিক বয়সী, নারী, প্রতিবন্ধী, রোগী প্রমুখকে এই কর দিতে হতো না। এই করের ফলে হিন্দু প্রজা কখনো অসন্তুষ্ট হয়েছে— এরকম কোনো প্রমাণ ইতিহাসে মেলে না।

এবার আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করা যাক। মোগল বাদশাহ বাবর বিদেশি ছিলেন। তাঁর পুত্র বাদশাহ হুমায়ূন কাবুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অবশিষ্ট মোগল সম্রাটগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কট্টর সুন্নি মুসলমান ছিলেন। তাঁদের নীতি-নৈতিকতা ইসলামের নৈতিক ও দার্শনিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তবে এদেশের মুসলিমদের প্রতি বিশ্বাস কম ছিল। ফলে, তাদের মনসবদারদের অথবা তাদের নির্ধারিত সরদারদের এক-একটি আলাদা শ্রেণি বের করে নিতে হয়। দশ হাজার ঘোড়ার সরদারকে প্রথম শ্রেণির সরদার বলে মান্য করা হতো। প্রয়োজন পড়লে এঁরা সসৈন্যে হাজির হয়ে যেতেন। আওরঙ্গজেবের আমলেও এই ব্যবস্থা ছিল। তাঁর

www.pathagar.com

পদাতিক বাহিনী খুব দুর্বল ছিল। কিছু বড় ধরনের তোপও রাখা হতো। এই প্রকারের সমস্ত সৈন্যের শাহি ফরমানের ক্ষমতা সবার ওপরে থাকত।

আকবর যেভাবে সাম্রাজ্যকে ভিন্নভিন্ন প্রান্তে বিভক্ত করে সুবেদার নিযুক্ত করেছিলেন আওরঙ্গজেবও ওই ধারাবাহিকতা জারি রেখেছিলেন। প্রান্তগুলোতে সুবেদারের স্থান এবং বড় ওহদেদার মনসবদারদের ভিতর থকেই নির্বাচিত করা হতো এবং বেতনের বদলে জায়গির এবং ভূমি দেওয়া হতো। আওরঙ্গজেব সমস্ত ভারতবর্ষকে তাঁর সম্পত্তি মনে করতেন এবং তাঁর প্রজাদের তিনি তারই উত্তরাধিকার মনে করতেন। যখন কোনো মনসবদার বা সরদার মারা যেতেন তখন বাদশাহ তার উত্তরাধিকে তার জায়গিরটি দিয়ে দিলেই তবে সে জায়গির পেতে পারত। জমি চাষ করে শস্য হতো। এই ফসল উসুলকারী কর্মকর্তা প্রান্তের হাকিমের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। বণিক কোথাও তার মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে পারত না। যেখানে খুব ভালো বাণিজ্য চলত অথবা কোনো বড় বন্দরগাহ থাকত সেখানে কিছু বড় বণিক বাড়ি নির্মাণের অনুমতি পেতে পারত কিন্তু বাদশাহ চাইলে তার মালিকানা কবজা করে নিতে পারতেন। এ থেকে আওরঙ্গজেবের ক্ষমতা নিরূপণ করা যাবে। আওরঙ্গজেবের মনসবদারদের রবদবা ও ঠাটবাট ছিল অপূর্ব। তাদের তো অনেক খরচ করতে হতো তবে ঋণগ্রস্ত হলে অনেক কষ্টও সইতে হতো।

কিছু আমির অসংখ্য দ্রব্য একত্রিত করতে সমর্থ হতেন। দূর-দূরান্তের সুবেদাররা অন্যায়ী হতেন এবং প্রায়শ প্রজাদের ওপর অত্যাচার করতেন বলে জানা যায়। পূর্বতন মোগল সম্রাটদের ন্যায় আওরঙ্গজেবও সাম্রাজ্যের প্রজাদের সন্তানতুল্য মনে করতেন। প্রজাদের ওপর কোনো অত্যাচার তাঁরা মেনে নেননি। সেই অত্যাচারীদের তাঁরা যথারীতি শাস্তি দিতেন। আওরঙ্গজেব নিজেও ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ এবং ছিলেন অতিশয় সদাচারী এবং সত্যপ্রেমী। তিনি স্বয়ং সত্যনিষ্ঠ এবং অন্যদের প্রতিও নিজের প্রভাব ফেলতেন। তবে, যেমন যেমন সাম্রাজ্যের সীমা বাড়তে থাকে তেমন তেমনই সব প্রান্তের ওপর দৃষ্টি রাখা সুকঠিন হয়ে পড়ার ফলে প্রশাসনে শিথিলতা আসতে লাগল। তাঁর কাছে যখন কোনো সুবেদারের অনাচারের খবর আসত তখন তিনি তাকে কঠিন দণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। তিনি একই কর্মকর্তাকে একই স্থানে বেশিদিন রাখতেন না। এর ফলে একজন কর্মকর্তা একস্থলে অল্পদিন যাবৎ কাজ করার ফলে যত দ্রুত সম্ভব অর্থকড়ি কামিয়ে নিতে পারত। ফলে, কাজে দুর্নীতি এসে যেত। তবে, এতে কোনো সন্দেহ

www.pathagar.com

নেই যে, আওরঙ্গজেব নিজে প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ এবং সত্যনিষ্ঠ বাদশাহ ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের আমলে রাজস্ব ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল এবং সব মিলিয়ে আয় ৩০ থেকে ৩৫ কোটি ছিল। এ থেকে বোঝা যায় যে, সাম্রাজ্য খুবই সমৃদ্ধ ছিল এবং মানুষ সুখে-শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করত। এত উৎপাদন সত্ত্বেও সম্রাটের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হতো। এর কারণ ছিল দেশের সেনা ব্যবস্থা খুবই ভারি ছিল, ফলে প্রচুর ব্যয় বহন করতে হতো। সে জন্য তাঁর পর রাজকোষে তিনি কেনো বৃহৎ পরিমাণ অর্থ রেখে যেতে পারেননি।

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে আমরা এই মহান মোগল বাদশাহ সম্পর্কে বহুকিছু জানতে পারলাম। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে এই মহান বাদশাহ সম্পর্কে আমরা কিছু বিবেচনা করতে পারি। দোষগুণ মানুষের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। দোষের সঙ্গে গুণ এবং গুণের সঙ্গে দোষ স্বাভাবিকভাবেই থেকে যায়। তবে, গুণ যখন মানুষের দোষকে ছাপিয়ে যায় তখন আমাদের সামনে থেকে দোষ অন্তর্হিত হয়ে যায়। আবার দোষ যখন মানুষের গুণকে ছাপিয়ে যায় তখন আমরা তার মধ্যে দোষই দোষ দেখি। আওরঙ্গজেব বাল্যকাল থেকেই ইসলাম ধর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ভালোবাসা সাধারণ মাপকাঠি দিয়ে নিরূপণ করা যায় না। তিনি নিজধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বলে অন্য ধর্মের প্রতি তিনি বিপরীত মনোভাব পোষণ করতেন না। ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধার কারণেই তিনি পিতাকে আমৃত্যু বন্দী করে রাখেন এবং দারা, সুজা ও মুরাদকে বিচারের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেন। এই কারণেই তিনি তাঁর ছোট বোন রোশনআরাকে বাদ দিয়ে, যিনি তাঁর সিংহাসন লাভে সবচেয়ে বড় সাহায্যকারিণী ছিলেন।' বাদ দিয়ে তিনি তাঁর সর্বজ্যেষ্ঠ বোন জাহানআরা, বেগম সাহিবাকেও কষ্ট দিতে কসুর করেননি। এই দেবীতুল্য মহীয়সী কয়েদখানায় পিতা শাহজাহানকে আজীবন দেখভাল করেন এবং সাম্রাজ্যের দুঃখবেদনায় অংশগ্রহণ করেন। এ বাবদে জাহানআরার আত্মদানের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা হয়ে গেছে।

আওরঙ্গজেব কিছু লোভী প্রকৃতির ছিলেন সে জন্য অর্থ নেওয়ার লালসায় কখনো বা হিন্দু ধর্মাচার্যদের কষ্ট দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তবে, একইভাবে মুসলমানদের ফকিরদেরও কষ্ট দিতেন বলে জানা যায়। কথিত আছে, একবার আওরঙ্গজেবের মনে হলো গোপনভাবে সঞ্চিত অর্থ তিনি উদ্ধার করবেন। এতে তিনি সহজেই সিদ্ধ হবেন। একথা মনে করে তিনি রাজ্যের

www.pathagar.com

সর্বত্র ট্যাঁটরা পিটিয়ে দিলেন যে, আমার তরফ থেকে রাজ্যের ফকিরদের দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে, সব ফকির অমুক দিন অমুক জায়গায় হাজির হয়ে যাবেন। খোদ বাদশাহ ধর্মীয় অনুপ্রেরণায় প্রেরিত হয়ে পানাহার সামগ্রী ও বস্ত্রাদি প্রদান করবেন। এতে ফকিরের খুশি হয়ে তাঁর প্রশংসা কীর্তন ও সেই সঙ্গে দোয়া দিতে থাকলেন। এভাবে ফকিরেরা দলে দলে রাজধানীতে এসে জড়ো হতে লাগলেন। তাদের উত্তমরূপে পানাহার করানো হলো। ফকিরেরা খুবই প্রসন্ন হলেন এবং আশীর্বাদ দিয়ে বাদশাহকে খুশি করে বিদায় প্রার্থনা করলেন। আওরঙ্গজেব বললেন, মহাত্মাগণ, আপনাদের এ কথা মনে করা উচিত নয় যে, আমি আপনাদের ভুলে গেছি। আজ আমার এ শান-শৌকত বলেন অথবা জালালি কারনামা বলেন, এ হলো আপনাদের দোয়ার পরিণাম। এ কথা ভুলে যাওয়ার মতো মূর্খ আমি হতে পারি না। যেভাবে আপনারা আপনাদের ভোজনে অংশ নিয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন ওই রকমই আপনাদের জন্য প্রস্তুতকৃত নতুন বস্ত্র পরিধান করে আমাকে কৃতার্থ করবেন। আপনারা আপনাদের জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে এখানকার নতুন বস্ত্র পরিধান করুন। এ কথা বলে তিনি বস্ত্রাদি আনালেন কিন্তু ফকিরেরা নিজেদের জীর্ণশীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে থাকতেই পছন্দ করল। বাদশাহের আদেশে তাঁর কর্মচারীরা তাদের পুরাতন বস্ত্র জোর করে খুলে ফেলল এবং তাদের দেহের সঙ্গে লুকিয়ে রাখা অলঙ্কারাদি বের করে নিল। আওরঙ্গজেব জানতেন যে, এসব ফকির গরিব হওয়ার ভান করে এবং অর্থ-কড়ি পোশাকের আড়ালে লুকিয়ে রাখে। সে জন্য তিনি এই যুক্তি খাড়া করে এভাবে ধন একত্রিত করলেন। তিনি তাঁর এই প্রকৃতিকে এভাবে নিবৃত্ত করতেন বলে জানা যায়।

তিনি ছিলেন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। অন্যায়-অনাচারকে তিনি কখনো প্রশ্রয় দেননি। তিনি উত্তম রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন এবং ধর্মাত্মা রাজর্ষি খেতাব লাভ সমর্থ হয়েছিলেন। অল্পকিছু দোষের সঙ্গে তাঁর যা গুণ ছিল, তা ছিল বিস্ময়কর।

বহু গুণের অধিকারী আওরঙ্গজেব একজন সেনাপতিরূপে খুবই সফল ছিলেন। তাঁর সঙ্গে টক্কর দেওয়ার মতো সেনাপতি তাঁর যুগে কেউ ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন যথার্থ জ্ঞানী, উত্তম শিক্ষক। ধর্মবেত্তা পণ্ডিত এবং আচার্য। সাম্রাজ্যের যেকোনো বিভাগে সর্বোচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে কাজ করার অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন তিনি। কিন্তু এত বড় সাম্রাজ্যের প্রশাসন চালানোর জন্য যে লোকবলের প্রয়োজন ছিল তা তাঁর যুগে অপ্রতুল

www.pathagar.com

হয়ে পড়েছিল। তিনি জাহাঙ্গীরের আমলের আসফ খান, মহাবত খান তথা খানজাহানের মতো সেনাপতি পাওয়া থেকে বঞ্চিত ছিলেন। অথচ এঁদের সম্মিলিত যোগ্যতা তাঁর একারই ছিল। ফলে, সেনাপতিরূপে কেউই তাঁর সঙ্গে টক্কর দিতে পারতেন না। পারিবারিক জীবনে তিনি অত্যন্ত শুদ্ধাচারী ও সদাচারী জীবনযাপন করতেন। তাঁর সদাচারী জীবনে আমোদ-প্রমোদ, সংগীত নৃত্যাদির কোনো স্থান ছিল না। বলা যেতে পায়ে যে, তাঁর সাধারণ গৃহস্থি জীবন ছিল একজন আদর্শ মহাপুরুষের জীবনের মতো।

আওঙ্গজেবের দিনচর্যার অত্যন্ত আকর্ষণীয় বৃত্তান্ত আলমগীরনামা গ্রন্থে পাওয়া যায় যা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজকার্যে কোনো প্রকারের অবহেলাকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। কর্মকর্তাদের থেকে তাদের কাজ তিনি অত্যন্ত কঠোরভাবে আদায় করে নিতেন। তাঁর কর্মকর্তারা তাঁকে খুবই ভয় করতেন এবং বাদশাহের ফরমান অবজ্ঞা করার মতো হিম্মত কারোরই হতো না। আর কেউ করে থাকলে তাকে কঠোর দণ্ড ভোগ করতে হতো।

তিনি ভোর পাঁচ ঘটিকায় শয্যা ত্যাগ করতেন। ফজরের নামাজ পড়তেন এবং অজিফায় থাকতেন। সাড়ে সাতটা-আটটায় তাঁর শোওয়ার ঘরের খিড়কি থেকে একত্রিত লোকদের দর্শন দিতেন।

সওয়া নয়টায় দীওয়ান-এ-আমে দুঘণ্টা অবধি দরবারে উপস্থিত থাকতেন।

বেলা ১১.০০ টাকায় দীওয়ান-এ-নাম মণ্ডলীকে এবং অধিকারীদের ডেকে জরুরি কাজ করতেন। তারপর বিশ্রাম নিয়ে আহার করার পর বিশ্রাম নিয়ে প্রস্তুত হতেন।

বেলা ২.০০ ঘটিকায় যোহরের নামাজ পড়তেন রাজপ্রাসাদের খাস মসজিদে। এ সময়ে খাস আমিরও হাজির থাকতেন। ২-৩০ ঘটিকায় খাওয়ার ঘরে লেখাপড়ার কাজ এবং রাজকার্য বিষয়ক অন্য কাজও করে নিতেন। আসরের নামাজও ওখানেই পড়তেন। ৫.৩০ ঘটিকায় খানগী দরবারে মাগরিবের নামাজ পড়তেন। ৬.৪০ ঘটিকায় ইশার নামাজ পড়তেন। তবে, তা বেলা বাড়া-কমার ওপর নির্ভরশীল ছিল। তারপর, কখনো কখনো উজিরদের সঙ্গে কাজকাম সারতেন। তাঁর দরবারে নাচ-গান হতো না। কেননা, এ কাজকে তিনি অত্যন্ত মন্দ বলে গণ্য করতেন।

www.pathagar.com

৭.৪০ ঘটিকায় দরবারের সমাপ্তি।

৮.০০ ঘটিকায় অন্তঃপুরে ধার্মিক কৃত্য, অজিফা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত বৃত্তান্ত হতে এটাই মনে হয় যে, আওরঙ্গজেব নিয়মিত মিতাহারী জীবন যাপনকারী বাদশাহ ছিলেন। তিনি শরীরকে হালকা-পাতলা করে রেখেছিলেন। তিনি অপার কর্মশক্তির অধিকারী ছিলেন। নব্বই বছর বয়সেও সমস্ত রাজকার্য তিনি নিজে করতেন এবং যুবা বয়সে কৌশল তথা কাজকর্মের যে ফুর্তি তাঁর মধ্যে ছিল বার্ধক্যেও তা অটুট ছিল।

আওরঙ্গজেবের কিছু অভ্যাসের কথা বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য। তিনি যখন খেতে বসতেন তখন প্রত্যেক বস্তু থেকে প্রথমে তাঁর কন্যাগণ এবং তিন উমরা প্রথমে খেতেন। তিনি সর্বদাই গঙ্গাজল পান করতেন। তিনি এই জলকে বেশি পছন্দ করতেন। তিনি হিন্দুস্তানের যেখানেই থাকুন না কেন, তার জন্য তামার বড় বড় পাত্র ভরে গঙ্গাজল পাঠানোর ব্যবস্থা করা হতো। যখন তিনি অসুস্থ হয়ে পড়তেন তখন ওই দাওয়াই যা তিনি সেবন করতেন, তা প্রথমে তাঁর বৈদ্যকে বা হাকিমকে খেয়ে দেখিয়ে দিতে হতো। যুবক বয়সে বেগমদের প্রতি তাঁর গভীর আকর্ষণ ও ভালোবাসা রাখতেন। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে-সাথে এই সম্পর্কে সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে আলগা হয়ে পড়তে থাকে এবং পরে দূরে থাকতে থাকেন। অন্তঃপুরের দেখাশোনার দায়-দায়িত্ব তিনি খোজাদের দিয়ে রেখেছিলেন।

প্রত্যেক কাজে তাঁর তদারকির অভ্যাস ছিল। সে জন্য দূর-দূরান্তের সুবেদারগণ তাঁর ফরমান ব্যতীত কোনো কাজ করতেন না। এভাবে অমাত্যদের অবসর গ্রহণের পর অনেক জটিলতার সৃষ্টি হতো। পুত্র বা কন্যাসহ কোনো অধিকারীকেই তিনি বিশ্বাস করতেন না। এই স্বভাবের কারণে ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে অনেক দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পড়তে হয় এবং তাঁর এই মহাসাম্রাজ্যেরও অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। তাঁর মধ্যে গভীর শান্তি ও স্থৈর্য ছিল। যেকোনো কঠিন পরিস্থিতি তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সামাল দিতে পারতেন। যেকোনো বিপত্তির সময়ে অত্যন্ত শান্তচিত্তে দূরদর্শিতার সঙ্গে কাজ করতে পারতেন। তিনি সবসময় এ কথা মানতেন যে, বড় মানুষেরই সবসময় সাবধান থাকা উচিত। কেননা, তাঁর জিম্মেদারি সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে।

তাঁর শারীরিক অবস্থা উত্তম না থাকা সত্ত্বেও অক্লান্তভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করে যেতে পারতেন। রাজ দরবারি বিষয়ে তিন— সাম, দাম, দণ্ড ভেদ

www.pathagar.com

দ্বারা কাজ সারতে তিনি বড়ই সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন তিনি তরবারি চালনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন তেমন খেলোয়ার ছিলেন।

আকবরের মতো উদার ও বিশাল হৃদয় না হওয়ার ফলে আকবরের চেয়েও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর মতো যশস্বী হতে পারেননি। কেননা, তাঁর প্রশংসকরা প্রধানত অমুসলিম এবং তাঁর দ্বারা সুযোগসুবিধা প্রাপ্ত এবং সুবিধাভোগী ছিলেন। আর এ কথাও সত্য যে, অমুসলিমরা সাধারণত সেই মুসলমানের প্রশংসা করে যার দ্বারা তার নিজের সমাজের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তারা তার সুবিধা ভোগ করে। আকবর এবং আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। তবে এ কথাও সত্য যে, আওরঙ্গজেব কোনো হিন্দু-বিরোধী কাজ করেছেন বলে ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং আকবরের চেয়ে আওরঙ্গজেবের আমলে হিন্দুদের এ বিদ্বেষ তাদের পরধর্ম ও পরজাতি বিদ্বেষের পরিচয়কে অধিক প্রকট করে।

এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, আওরঙ্গজেবের হাত দিয়েই মোগল ভারত অবিভক্ত ভারতের মানচিত্র পরিগ্রহ করে। তবে, এ কথাও সত্য যে, তিনি শুধু সাম্রাজ্যভোগী সম্রাট ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুগন্ধর পুরুষ, যুগান্তকারী চিন্তানায়ক। তিনি ভারতের মুসলমানদের ভাবনা ভেবেছিলেন। ভেবেছিলেন তাদের ভবিষ্যতের কথা। এই ভাবনা কিন্তু আকবর ভাবেননি। সম্ভবত, ভারতের মুসলমানদের ভবিষ্যতের কথা ভাবার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও দূরদর্শিতা তাঁর ছিল না। ভারতীয় মুসলমানদের জন্য অমর কীর্তি 'ফতোয়া-এ-আলমগীরী' রচনা ও পরিকল্পনার যোগ্যতা আকবরের ছিল না। আকবরের এই অযোগ্যতা ও অদূরদর্শিতাই সম্ভবত হিন্দুদের কাছে আকবরের এতটা জনপ্রিয়তার কারণ। আর এর ঠিক উল্টোটাই আওরঙ্গজেবের অজনপ্রিয়তার কারণ। তিনি কট্টর সুন্নি মুসলিম ছিলেন। ন্যায়প্রিয়তা, ইসলামি নৈতিকতা ও আদর্শের প্রশ্নে তিনি কখনো আপস করেননি। এ হিসেবে তিনি মোগল সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন।

সংগীত-নৃত্যাদি বিভিন্ন কলাকে তিনি মন্দ বলে গণ্য করতেন। তিনি মনে করতেন এসব ললিত কলা মানুষের প্রবৃত্তিকে পাপাচারের কাজে প্রভাবিত করে।

আওরঙ্গজেবের এই প্রকারের কিছু ত্রুটিবিচ্যুতিকে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলে অভিহিত করা হয়। আমার মনে হয় এ ধরনের কারণগুলো

www.pathagar.com

একটি সাম্রাজ্যের পতনের সঠিক কারণ বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়; বরং এ বিষয়ে আরো গভীর পর্যালোচনা দাবি করে।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যের পতন হতে শুরু করে এ কথা সত্য। মোগল সাম্রাজ্য ভিতর থেকে ঘোকলা হয়ে গিয়েছিল— বিষয়টি লোকে জেনে গিয়েছিল। এটাই প্রকৃতির নিয়ম যে, কোনো বস্তুতে যখন ভিতর থেকে পচন ধরে তখন সে আর অধিক দিন টিকে থাকতে পারে না। এভাবে বড় বড় সাম্রাজ্যের যখন ঘুণ ধরে তখন কালচক্র তাকে উপড়ে ফেলে দেয়। এভাবে আওরঙ্গজেবের শেষ দিনগুলোতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সুর বেজে ওঠে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

www.pathagar.com